কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

জুলাই ১৯৮৬

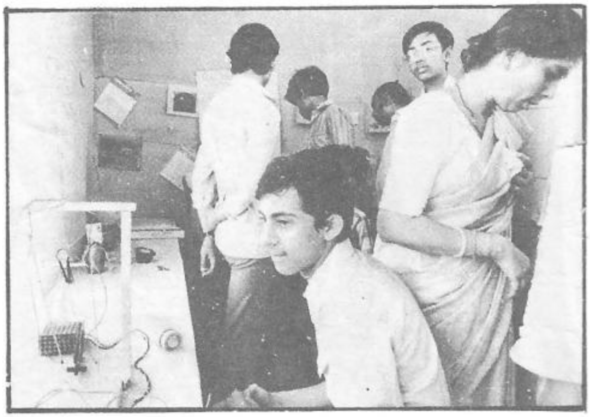

শৈব্যা পুস্তকালয় প্রদত্ত রণজিৎ স্মৃতি পুরস্কার লীলা মজুমদারের হাতে তুলে দিচ্ছেন অনুষ্ঠান সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র।

মডেল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী

পঞ্চমবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে সমবেত বিজ্ঞানুরাগী শ্রোতৃবৃন্দ

ষষ্ঠ বর্ষ। তৃতীয় সংখ্যা জুলাই '1986

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 4 : **দপ্তর থেকে** : এই পৃথিবীতে 5 জন । সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প : সমস্যা কবলিত মহাকাশ যান ॥ দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় 34 : নীল দেশে ॥ প্রচেতারঞ্জন নন্দী 47

বিশেষ রচনা : আমাদের ছায়াপথে আমরা কোথায় ॥ অরূপরতন ভট্টাচার্য 19

পড়াশোনা : মজার গুণফল ॥ শান্তি নন্দী 41 : পদার্থ বিজ্ঞানের কথা ॥ অজয় চক্রবর্তী 15 : রসায়ন ও তার ভাষা ॥ অমরনাথ রায় 17 : শোষণ ॥ দিনোজকুমার দে 51

ছবিতে গল্প : খুদে বিজ্ঞানী ॥ দিলীপ দাস 23 : ওয়্যার অব দি ওয়ার্ল্ড'স ॥ গৌতম কর্মকার 43

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : বিজ্ঞান প্রচারক স্বর্ণকুমারী দেবী ॥ এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় 39

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ রচনা : পরিবেশ সমস্যা ॥ ভবানী মুখার্জী 5 : মহাদেশগুলি কি সঞ্চরমান ? ॥ চন্দন চ্যাটার্জী 37 : বিজ্ঞান সমাবেশ ॥ কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 52 : কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ 22 : বিজ্ঞান সংবাদ 65 : সৌর জগতের বয়স কত ॥ মৃন্ময়ী দাশ 28 : হৃৎপিণ্ডের গঠন ও কাজ ॥ ননীগোপাল দাস 29 : জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই 16 : মজার ইলেকট্রনিক্স প্রজেক্ট ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 18 : গাইগার মুলার কাউন্টার ॥ সত্যজিৎ সেন 22

আবিষ্কারের গল্প : বিশ্বের প্রথম থার্মোমিটার ॥ বদ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 27

রঙীন ফিচার : জানা-অজানার খবর ॥ রেবতীভূষণ 11 : চীনে এলেন মার্কো পোলো ॥ কিন্নর রায় 12 : সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ও ফোটো ক্যুইজ 14 : সমাধান 14 : ডাকুর ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 55 : আলো জ্বলে কেমন করে ॥ অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ 56 : আই কিউ টেস্ট 57 অ্যানহাইড্রাইট ॥ অমরনাথ রায় 57 : জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ও ফটো ক্যুইজ 58 : সমাধান 58

জীবজন্তু ও গাছপালা : গাছপালার গল্প ॥ অরবিন্দ ঘোষ 42

ধারাবাহিক উপন্যাস : নরবানরের গ্রহে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 31

ধারাবাহিক প্রবন্ধ : টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ ॥ বিমান বসু 9

ছোটদের দপ্তর : উত্তরদাতাদের নাম 59 : প্রশ্নোত্তর ॥ সুধাংশু পাত্র 63 : শব্দকূট ॥ সুকৃৎ ঘোষ 66 : শতঘরী ঘনাদাকূটের সমাধান 66 : এপ্রিল সংখ্যার আই কিউ টেস্টের সমাধান 61 : এমার্জেন্সী ল্যাম্প ॥ দীপঙ্কর মান্না 64

প্রচ্ছদ : অলয় ঘোষাল। **অন্যান্য ছবি** : অলয় ঘোষাল ও পার্থসারথি মণ্ডল

আলোক চিত্র : কল্যাণ চক্রবর্তী, শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও অভিজিৎ রায়

প্রধান সম্পাদক সমরজিৎ কর

সম্পাদক রবীন বল। সহসম্পাদক জয়ন্ত দত্ত

জীবন্ত জীবাশ্ম

'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে জীবন্ত জীবাশ্ম কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তরে সুধাংশু পাত্রের সাথে আমি একমত হতে পারলাম না। উনি জীবাশ্মর সংজ্ঞা দিয়েছেন অথচ জীবন্ত জীবাশ্ম কাকে বলে এর উত্তরটি দেন নি। আমি এর উত্তরে জানাই, যে সকল জীবন্ত জীবে এমন সব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যা বিগত দিনে কোন জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল এবং ঐ জীবিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তনের সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় একেই জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। সুধাংশু পাত্র ডিম পাড়ে অথচ স্তন্যপায়ী এমন একটি প্রাণীর নাম—এই উত্তরটিও দেন নি। উত্তরটি জানাই হংসচঞ্চু—।

অতনু বসু, নারায়ণপুর, ব্যান্ডেল

এ-মাসের কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান সংখ্যায় 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে দু'জন পাঠক জানতে চেয়েছেন জীবন্ত জীবাশ্ম কি এবং ডিমপাড়ে এমন একটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম। হয়ত কোনো কারণে উত্তরদাতা সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারেন নি। যাইহোক, জীবন্ত জীবাশ্ম হল এমন কতকগুলো জীব, যারা সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে বেঁচে আছে, অথচ এদের সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় সকলেই বহু পূর্বে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে এবং বিবর্তনের ইতিহাসে যাদের অঙ্গের কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় নি, তাদের জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। যেমন – মৎস্য জাতীয় সিলাকান্থ, সরীসৃপ শ্রেণীর স্ফেনোডন, উদ্ভিদের দিক থেকে সাইকাস প্রভৃতি।

আর, ডিম পাড়ে অথচ স্তন্যপায়ী এমন একটি প্রাণীর হল হংসচঞ্চু বা প্ল্যাটিপাস।

রূপান্বিতা নন্দী, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

প্রণব চক্রবর্তী ও ভোলানাথ পালের প্রশ্নোত্তরে—প্রশ্নোত্তর বিভাগে আপনারা জীবন্ত জীবাশ্ম কাকে বলে, তা না জানিয়ে ভুল করে জীবাশ্ম কাকে বলে জানিয়েছেন এবং ডিম পাড়ে এমন স্তন্যপায়ী প্রাণীর কোন নাম উল্লেখ করেন নি। আমার মতে যে সকল প্রাণী সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে অথচ তাদের সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় জীব বহু পূর্বের পৃথিবী থেকে বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয়েছে তাদের জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। যেমন লিমুলাস এবং ডিম পাড়ে এমন একটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম হংসচঞ্চু।

নবেন্দু মণ্ডল, ঈশ্বর চন্দ্র পুর, নদীয়া।

'জীবন্ত জীবাশ্ম' বা 'লিভিং ফসিল' কাকে বলে? সুধাংশু পাত্র মহাশয় এর উত্তরে লিখেছেন জীবাশ্ম কাকে বলে। উত্তরটি ঠিক নয়, তিনি প্রশ্নটি একটু খেয়াল করেন নি বলে এই ভুল হয়েছে। সঠিক উত্তর হল যে সকল প্রাণী বহুযুগ পূর্বে এসেছিল এবং যারা আজও অবিকৃত রূপে সজীব অবস্থায় পৃথিবীতে অবস্থান করছে, অর্থাৎ আজ আমরা যাদের বহুযুগ পূর্বের জীবাশ্ম জীবন্ত রূপে পাই, তাদের বলে জীবন্ত জীবাশ্ম। যেমন—উদ্ভিদ ডিঙ্গোবাইলোবা, প্রাণী স্ফেনোডন প্যাংটেটাম।

তপোব্রত মিত্র, বারুইপুর দক্ষিণ 24 পরগনা।

রক্তে জলের পরিমাণ

আমরা আপনার পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। পড়াশুনার বিভাগটি আমাদের খুব-ই ভাল লাগে। অক্টো-নভেঃ '85-র সংখ্যায় নবম পৃষ্ঠায় 'পদার্থ' বিদ্যা'য় সপ্তম প্রশ্নটি ছিল, 'শূন্য মাধ্যমে কোন রশ্মির গতিবেগ আলোর বেগের সমান (3×10^{10} মিটার / সেকেণ্ড)' কিন্তু আলোর গতিবেগ 3×10^{10} সেণ্টিমিটার সেকেণ্ড।

তাছাড়া ঐ সংখ্যাতেই '**জল আমাদের জীবন**' রচনাটিতে দেওয়া আছে রক্তে জলের পরিমাণ শতকরা প্রায় 40 ভাগ। কিন্তু রক্তে জলের পরিমাণ 90—92% (প্রায়)।

অজয় চট্টোপাধ্যায় ও
বিজয় চট্টোপাধ্যায়
আর্যনগর, হুগলি।

'হ্যালির ধূমকেতু' সংখ্যা

আমি কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা এবং বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে আপনারা বিজ্ঞানকে সুষ্ঠুভাবে জনগণের কাছে প্রকাশনের জন্য যে গুরু দায়িত্ব যথেষ্ট দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে চলেছেন, তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। হ্যালির ধূমকেতুকে বিভিন্ন মহাকাশযানের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হল। আপনাদের হ্যালির ধূমকেতুর সংখ্যা পাঠ করে হ্যালির ধূমকেতুর সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য জানতে পারলাম। এখন হ্যালির ধূমকেতুর সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন মতবাদ এবং মহাকাশযানের সাহায্যে হ্যালির ধূমকেতুর পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলি বিশেষ পত্রিকার সাহায্যে প্রকাশ করলে বিশেষ আনন্দিত হব।

অভিজিৎ কুণ্ডু,
রানাঘাট, নদীয়া।

পরিবেশ সমস্যা

ভবানী মুখার্জী

মন্ত্রী—পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সভ্যতার উন্মেষের সময় পর্যন্ত গাছপালা পশুপাখির মত মানুষও এই পৃথিবীর প্রকৃতি এবং অরণ্য জীবনের অংশ বিশেষ ছিল। অন্যান্য পশুপাখির মতই বনের ফলমূল ইত্যাদি থেকে সে তার আহার্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকত। কিন্তু প্রাণিজগতে সব চাইতে বুদ্ধিমান বলে সে ধীরে ধীরে আগুনের ব্যবহার শিখল, চাষবাসের পদ্ধতি তার করায়ত্ত হল এবং ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীর ওপর মানবগোষ্ঠী তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। সভ্যতার দ্রুত বিকাশের জন্য মানুষ বিজ্ঞানকে জানল, শিখল প্রযুক্তিবিদ্যা। দিকে দিকে নগরায়ন হল, কলকারখানা বসল, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে উড়ল মানুষের বিজয় কেতন।

সভ্যতার দ্রুত বিকাশ ঘটাতে গিয়ে মানুষ প্রকৃতির ওপর শুরু করল অবাধ লুণ্ঠন। বন কেটে নগর বসল। বনের সঙ্গে উৎখাত হল বহু বন্যপ্রাণী। মানুষের সীমাহীন প্রয়োজনে ভূগর্ভ বিদীর্ণ করে উঠে আসতে লাগল কয়লা, তেল, বহুবিধ খনিজ পদার্থ। নদীর ঘাড় ধরে আদায় করা হতে লাগল বিদ্যুৎ, সেচের জল। সভ্যতার এবং অগ্রগতির স্বার্থে এ সবেরই হয়ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু স্বার্থান্ধ মানুষ এ বিশ্বটাকে একমাত্র তার নিজের বলে ভাবতে লাগল এবং অন্যান্য প্রাণী ও প্রকৃতির গাছপালা ইত্যাদির বাঁচা মরা তার নিজের খেয়াল খুশির ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ধীরে ধীরে ফলতে শুরু করেছে। নির্বিচারে বন ধ্বংস করার ফলে শুরু হয়েছে বন্যা, পাহাড় অঞ্চলে নামছে ধস। এর ফলে প্রতি বছরই বহু প্রাণ বিনষ্ট হচ্ছে, বহু জায়গায় ফসল নষ্ট হচ্ছে, করছে নাগরিককে গৃহহীন। এদিকে কলকারাখানাগুলি থেকে যেসব দূষিত বর্জ্য পদার্থ বার করে দেওয়া হচ্ছে। মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে সেসব গিয়ে মিশছে নদীর জলে। এতে নদীর জল হয়ে পড়ছে বিষাক্ত এবং মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য। চিমনী নিঃসৃত অথবা ধোঁয়ার গ্যাস বায়ুস্তরের দূষণ ঘটছে। শহরাঞ্চলে তো এই দূষণের প্রধান কারণ ঘটাচ্ছে মোটর গাড়ির ধোঁয়া। এছাড়া রয়েছে শব্দ ট্রেন, প্লেন, জাহাজের শব্দ, মোটর গাড়ির ইলেকট্রিক হর্নের শব্দ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে মানুষের শ্রবণ যন্ত্রকে অকেজো করছে এবং তার জীবনী শক্তির ওপরও আঘাত হানছে। সাধারণ ভাবে প্রপেলার চালিত বিমানের শব্দ যথেষ্ট ছিল। শব্দের চাইতে দ্রুতগতিতে উড়ে যাবার আগ্রহে মানুষ আবিষ্কার করল জেট প্রপালশন চালিত বিমান এবং তীব্রতর করল শব্দ। সাম্প্রতিক কালে কনকর্ড বিমানের আবিষ্কার যে বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশেই সমালোচনার ঝড় তুলেছিল তার শব্দ দূষণের কারণে। এর ওপরে রয়েছে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পরিবর্ত শক্তির উৎসের সন্ধানে মানুষের প্রয়াস। আণবিক শক্তি আবিষ্কার, যেমন মানুষকে রাতারাতি অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে তেমনি সৃষ্টি করেছে মানব সমাজের পক্ষে এক ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা।

এই সব দৃষ্টান্ত থেকে মনে হতে পারে সভ্যতার বিকাশই মানবসমাজের ধ্বংসের কারণ হচ্ছে। কিন্তু পরিবেশ দূষণের জন্য সভ্যতার বিকাশকে দায়ী না করে

বলা যেতে পারে কিছু মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংসের সম্ভাবনার মুখোমুখি করে দিচ্ছে। সভ্যতা কখনোই এক জায়গায় থেমে থাকতে পারে না, তার অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি এবং প্রয়োজন নগরায়নেরও। কিন্তু এর পাশাপাশি মানুষকে শিখতে হবে সব কিছুরই পরিকল্পিত ব্যবহার। মানুষকেই অত্যন্ত সচেতন ভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে দায়িত্ব নিতে হবে। রক্ষা করতে হবে পৃথিবীর অরণ্য সম্পদ বন্যপ্রাণী। বায়ুস্তরকে দূষণমুক্ত রাখতে হবে। জলের উৎসগুলিকে রাখতে হবে পরিস্রুত। এর জন্য কলকারখানার মালিকদের তাদের বর্জ্য পদার্থ পরিশোধন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে আবর্জনার রিসাইক্লিং-এর। দূষণের সম্ভাবনা-যুক্ত কলকারখানাগুলিকে লোকালয় থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে। শহরে মোটর গাড়ির মালিকদের সচেতন হতে হবে যাতে ধোঁয়ায় নাগরিকদের ক্ষতি না হয়। খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে সচেতন হতে হবে যাতে ভেজাল বা ক্ষতিকারক কোন জিনিস খাদ্যবস্তুর মধ্যে মিশে না যায়। তার জন্য দরকার রঙ এবং রাসায়নিকের অত্যন্ত সতর্ক ব্যবহার। শহরাঞ্চলে শব্দের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মালিকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কাজকর্ম যাতে কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি অবাধে চালিয়ে যেতে না পারে, সেদিকে সরকার সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাও নিচ্ছেন। কিন্তু শুধুমাত্র আইন করে মানুষের চেতনা বাড়ানো সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব নিজেদেরকেই হাতে নিতে হবে। আজ সারা বিশ্বেই পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে। আমাদের দেশের মানুষের মধ্যেও ধীরে ধীরে এই চেতনার উন্মেষ ঘটছে। মানুষের শুভবুদ্ধির সহায়তায় একে ব্যাপক আন্দোলনের রূপ দিতে পারলে পটভূমির পরিবর্তন ঘটবে—মানব-সমাজের ভবিষ্যৎ হবে সুনিশ্চিত।

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে……।"

আসুন না আমরা বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে সমাজকে গড়ে তুলি, আমাদের সুন্দর পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করি। আসুন আমরা এক পতাকা তলে সমবেত হয়ে গণ-বিজ্ঞান আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যারা ভালবাসে মনে-প্রাণে, কামনা করে তার প্রচার ও প্রসার কেবল তাদেরই উদ্দেশে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সায়েন্স সোসাইটি'র এই আহ্বান। 3, 3-A ধারা অনুযায়ী ঘোষণা করা হচ্ছে যে সোসাইটির নতুন সদস্য গ্রহণ করা হবে।

নিয়মাবলী ঃ

1. *সদস্য-বিভাগ	প্রবেশ-চাঁদা টাঃ	চাঁদা টাঃ	যোগ্যতা
লাইফ মেম্বার	2000		আগ্রহী যে কোন মানুষ
কমন মেম্বার	25	10	,,
ডোনার মেম্বার	—	3000 বা ততোধিক	,,
এসোসিয়েট মেম্বার	3	3	ছাত্র
অ্যাফিলেটেড মেম্বার	—	—	বিজ্ঞান ক্লাব
ইনস্টিটিউশনাল মেম্বার	15	—	বিজ্ঞান ক্লাব

2. * এসোসিয়েট সদস্যদের থেকে উপযুক্ত যোগ্যতানুসারে এমন পঞ্চাশ জনকে নির্বাচিত করা হবে যাদের কোন সদস্য চাঁদা লাগবে না।

3. * 2'ট পঞ্চাশ পয়সার ডাক টিকিট সহ আবেদন করলে আবেদন পত্র পাঠান হবে। সদস্য গ্রহণের শেষ তারিখ 31 আগস্ট 86।

4. * বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সহযোগিতা করা হয়।

আবেদন পত্র ও বিশদ বিবরণের জন্য ঃ

Partha Sarathi Rudra, Chairman
The West Bengal Science Society
T. S. Camp ঃ Kadambini Tea Estate
Falakata-735211
Jalpaiguri.

ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

বিষয় ঃ রবীন্দ্রনাথ ॥ বিজ্ঞান ॥ শান্তি ॥ পরিবেশ

প্রবেশমূল্য নেই।

অংশগ্রহণে ইচ্ছুক স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

শিশির কুমার নিয়োগী, সচিব—ইনস্টিটিউশন অব পাবলিক হেলথ ইনজিনিয়ার্স।

1 গারস্টিন প্লেস। কলিকাতা-700 001

রচনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতায়

অংশগ্রহণে ইচ্ছুক স্কুলের ছেলে-মেয়েরা নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

পার্থসারথি রুদ্র, চেয়ারম্যান ওয়েস্ট বেঙ্গল সায়েন্স সোসাইটী কাদম্বিনি চা বাগান।

কালাকাটা-735 211 ● জলপাইগুড়ি।

এই পৃথিবীতে 5 জুন

সমরজিৎ কর

রীতিমত ভাবনার কথাই বলতে হয়। শুনলে অবাক হবে, পত্তনের পর থেকে পৃথিবীর বেশ কয়েকটি বড় শহর ধীরে ধীরে মাটির নিচে বসে যাচ্ছে। লণ্ডন বসেছে 0·30 মিটারের মত। ভেনিস 0·22 মিটার, তাইপি 1·90 মিটার, সাংঘাই 2·63, ব্যাংকক 1, টোকিও 4·50, ওসাকা 3, নিগাতা 2·50, সান হোসে 3·90, হিউস্টন 2·70, নিউ অরলিন্স 2, লং বীচ 9, মেকসিকো সিটি 8·50 এবং স্যান জোয়াকিন উপত্যকা 8·80 মিটার। কলকাতাও বসেছে। তবে কতটা, সে হিসেব এখনো সঠিক জানা যায় নি। বোম্বাইও বসছে, বসেছে মাদ্রাজ। ভূস্তরের নিচে কোথাও রয়েছে অতিরিক্ত গ্যাস, কোথাও তেল। আর জল তো সব জায়গাতেই থাকে। সেই গ্যাস তেল এবং জল ভূস্তর থেকে সংগ্রহ করতে গিয়েই যত বিপত্তি।

হয়ত জিজ্ঞেস করবে, তা 5 জুন-এর সঙ্গে এ সব ঘটনার সম্পর্ক কি ?

আছে, সম্পর্ক একটি আছেই। 5 জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস।' পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং সতর্ক করে তোলার জন্যে প্রতি বছর এই দিনটি পালন করা হয়। সেই সব সমস্যার মধ্যে একটি শহরগুলির বসে যাওয়ার ব্যাপারটা। তাই বড় বড় শহরের একটি বড় রকম সমস্যার কথাই তোমাদের জানিয়ে দিলাম।

উদাহরণ দিই, কেমন ?

হিউসটনের কথাই ধর। হিউসটন টেকসাসের একটি বড় শহর। আর টেকসাসের তেলের খনির কথা তো সবাই তোমরা জান। সেখানে ভূস্তরের অল্প নিচেই পেট্রোলিয়াম। জলও প্রচুর। শহরে উঠতে লাগল বড় বড় অট্টালিকা। সেখানকার মানুষ মাটির নিচ থেকে তুলতে লাগল তেল, চাষের জন্যে পাম্প বসিয়ে তুলতে লাগল জল। আর তার ফলে বসতে লাগল সেখানকার মাটি। তারপর গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত উঠতে লাগল বড় বড় বহুতল বাড়ি। তাদেরও তো ওজন কম নয় ? ফলে যা হয়, বসতে লাগল মাটি। বসতে লাগল শহরের ঘরবাড়ি। এখনো বসছে। ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে টোকিও শহরের ক্ষেত্রেও। শহরবাসীদের জন্যে চাই জল, কলকারখানার জন্যে চাই জল। প্রচুর জল। ভূগর্ভ থেকে সেই জল তুলতে গিয়ে টোকিওর মাটি দ্রুত বসে যাচ্ছে।

একই সমস্যা কলকাতাতেও দেখা দিয়েছে। এই শহরের মাটি পাললিক। সেই মাটির স্তরে রয়েছে জলের প্রবাহ। উঠছে একের পর এক বহুতল বাড়ি। তার চাপে শহরের মাটি বসছে। নলকূপের জলে এ শহরের চাহিদা মেটান যায় না। ফলে বসাতে হয়েছে গভীর এবং অগভীর নলকূপ। প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ জল তোলা হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ জলের চাপ মাটিকে ধরে রাখে। জল তোলার দরুন চাপ কমছে। তাই ভূস্তরের উপরে তৈরি বড় বড় বাড়ির ওজনে বসে যাচ্ছে জমি। তাই অনেকে মনে করছেন, কলকাতা শহরে বড় বাড়ি না তোলাই ভাল।

এ তো গেল একদিক। আমাদের দেশে এক এক অঞ্চলের পরিবেশ সমস্যা এক এক রকম। গ্রামাঞ্চলের কথাই ধর। চাষের জমিতে দেওয়া হয় নাইট্রোজেন সার। দেওয়া হয় পটাশ এবং ফসফরাস। সেচ এবং বর্ষার জলে সেই সারের বেশ কিছুটা অংশ পুকুর, ডোবা এবং নদীতে গিয়ে পড়ে। এর ফলে সেখানকার জলজ উদ্ভিদ বাড়তে থাকে। জলজ উদ্ভিদ মাছের খাবার ঠিকই। কিন্তু সেই উদ্ভিদের পরিমাণ যদি বেশি হয়, জলে অক্সিজেন কমে। বাড়ে কার্বন ডাই-অকসাইড। কার্বন ডাইঅকসাইড জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করে কার্বলিক অ্যাসিড। যা মাছের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। অকসিজেন কমে যাওয়ায় মাছের শ্বাসপ্রশ্বাসেরও কষ্ট হয়। পুকুর, ডোবা এবং নদীতে যাতে সার গিয়ে না পড়ে সেটা দেখা দরকার।

আরো একটি ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। এখন 400 কোটির মত। যে ভাবে বাড়ছে 2001 খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে 600 কোটির মত। এত মানুষের খাবার তো জোগাতে হবে। অতএব বাড়াতে হবে চাষের উৎপাদন। আর অতিরিক্ত চাষ করতে গেলে অতিরিক্ত সারও দরকার। এখানে আর একটি বিপদ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, নাইট্রোজেন সার সূর্যের আলোর স্পর্শে বাতাসের অকসিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করে নাইট্রোজেনের অকসাইড। সেই অকসাইড ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যায়। সেখানে রয়েছে ওজন গ্যাসের স্তর। এই ওজনের সঙ্গে অকসিজেন বিক্রিয়া করে। ওজন রূপান্তরিত হয় অকসিজেনে। এর ফলে ওজন স্তর হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য ওজন স্তর হাল্কা হওয়ার এটা অন্যতম কারণ। রেফ্রিজারেটার, মাথার

স্প্রে, গন্ধদ্রব্য গায়ে লাগানর স্প্রে—প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয় ফ্রেয়ন গ্যাস। এই গ্যাস ওজনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওজনের স্তর হাল্কা করে দিচ্ছে। ঊর্ধ্ব আকাশ পথে বেড়েছে জেট প্লেনের চলাচল। এই সব প্লেন থেকে বেরোয় জ্বালানীর অবশেষ হিসেবে নানা রকম গ্যাস। ওজনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এরাও ওজন স্তর হাল্কা করছে। সূর্য থেকে বিকীর্ণ হয় নানা রকম রশ্মি। অতিবেগুনী রশ্মি তাদের মধ্যে অন্যতম। এই রশ্মির বড় রকমের অংশ শোষণ করে ওজন স্তর। ওজন স্তর হাল্কা হলে, পৃথিবীর বুকে এই রশ্মির মাত্রা বাড়বে। উদ্ভিদ এবং প্রাণীর পক্ষে এই রশ্মি খুবই ক্ষতিকর। ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। যাই হোক, যেহেতু নাইট্রোজেন সার ওজন স্তর হাল্কা করায় কাজ করে, তাই অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা।

কলকারখানার চিমনি দিয়ে কয়লা এবং তেলের পোড়া জঞ্জাল ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বাতাসে। সেই জঞ্জালে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে কার্বন ডাইঅকসাইডও থাকে। পোড়ান হয় কাঠ। তা থেকেও নির্গত হয় কার্বন ডাইঅকসাইড। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার হিসেব মত এর ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅকসাইডের মাত্রা গত একশ' বছরে অনেকটা বেড়েছে। একশ বছর আগে ছিল প্রতি দশ লক্ষ ভাগে 250 ভাগ। এখন তা দাঁড়িয়েছে 390 ভাগে। কার্বন ডাইঅকসাইড শোষণ করে ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ অবলোহিত রশ্মি বা উত্তাপ। এর ফলে গত একশ' বছরের মধ্যে আবহাওয়ার তাপমাত্রা বেড়েছে 3 ডিগ্রী-সেলসিয়াসের মত। দেখা দিয়েছে আবহাওয়ার পরিবর্তন। কোথাও ঝড় জল কুয়াশা বেড়েছে বেশি। আবার কোন কোন অঞ্চল মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টির অভাবে। খবর পাওয়া গেছে, রাজস্থানের থর মরুভূমি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে পাঞ্জাবের দিকে, দিল্লীরও দিকে।

লোকালয়, পথঘাট তৈরি করতে গিয়ে বনের গাছ কেটে ফেলতে হয়। জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয় বনের কাঠ। বন কমে যাওয়ায় মাটি আলগা হচ্ছে। বাতাসে বেড়েছে ধূলিকণা। আবহাওয়াও পাল্টাচ্ছে।

পরিবেশের এমন অনেক সমস্যার ব্যাপারে প্রতিটি মানুষকে অবহিত করে তোলার জন্যেই পালন করা হয় 5 জুন—বিশ্বপরিবেশ দিবস। আর এই দিনটিতে পরিবেশ উন্নয়নের জন্যে নেওয়া হয় শপথ। আমরা আশা করি এ ব্যাপারে তোমরাও ভাববে। পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার জন্যে তোমরা নিজেরাও কিছু কিছু কাজ করবে।

টাটা ইনস্‌টিটিউট অফ্‌ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ

বিমান বসু

বলতে পারো, ভারতের কোন গবেষণাগারের গবেষণা-ক্ষেত্র ভূপৃষ্ঠের আড়াই কিলোমিটার গভীর থেকে নিয়ে সুদূর মহাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত? গবেষণাগারটি রয়েছে বম্বের কাছে কোলাবাতে, নাম টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ (Tata Institute of Fundamental Research) বা সংক্ষেপে 'টি. আই. এফ. আর'। বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী প্রয়াত ডঃ হোমি ভাবার উদ্যোগে 1945 সালে স্থাপিত গবেষণাগারটি আজ গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্বের অগ্রণী গবেষণা কেন্দ্রগুলির অন্যতম। শুরুতে এখানে প্রধানত চারটি বিষয় নিয়ে গবেষণা চালানো হতো। সেগুলি ছিল গণিত, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা, মহাজাগতিক রশ্মি এবং নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যা। কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে তাল রেখে গবেষণার ক্ষেত্র অনেক বিস্তারিত হয়েছে। বর্তমানে এখানে যে সব বিষয় নিয়ে গবেষণা চালানো হয় তার মধ্যে রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিপর্দার্থবিজ্ঞান, ঘনবস্তুর পদার্থবিদ্যা, ও ইলেক্ট্রনিক্স, আণবিক জীব-বিদ্যা (Molecular Biology) এবং কমপিউটার বিজ্ঞান। তবে সবকটি বিষয় নিয়ে গবেষণা চালানোর সুবিধা টি. আই. এফ. আর. এর কোলাবা মুখ্যালয়ে নেই। তার জন্য অন্যান্য কেন্দ্রে ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন ধরো রেডিও জ্যোর্তিবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্য তামিলনাড়ুর উটকামণ্ডে রয়েছে বিশাল রেডিও দূরবিন; মহাজগতিক রশ্মির অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে কর্ণাটকে কোলার স্বর্ণখনির কাছে ভূগর্ভে গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে; মহাকাশ থেকে আগত এক্স-রশ্মি এবং অবলোহিত রশ্মির অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে বায়ুমণ্ডলের ওপরে দূরবিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে যাবার জন্য বেলুন উৎক্ষেপণ কেন্দ্র রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদে। এছাড়া নিউক্লীয় পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্য কলকাতার সল্টলেকে স্থাপিত হয়েছে বিশাল 'ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন' যন্ত্র এবং মাধ্যাকর্ষণ বল সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ব্যাঙ্গালোরের কাছে গৌরি-বিদানুরে খোলা হয়েছে বিশেষ ভূ-কম্পন অধ্যয়ন কেন্দ্র।

গত কয়েক বছরে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশ্বের বহু প্রথম সারির গবেষককে আকৃষ্ট করেছে তা হলো সবকটি মৌলিক প্রাকৃতিক বলকে একসূত্রে বাঁধতে পারে এমন একটি 'গ্র্যাণ্ড ইউনিফায়েড থিয়োরি' (Grand Unified Theory) বা পূর্ণাঙ্গ একীকৃত তত্ত্বের উদ্ভাবন।

ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। তোমরা হয়ত জানো যে বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব দুইই হলো প্রাকৃতিক বল। আপাতদৃষ্টিতে পৃথক মনে হলেও এরা আসলে একই বলের দুটি বিভিন্ন রূপ। ঐ দুয়ের সমন্বয়িত বলকেই আমরা তড়িৎ চুম্বকীয় বল হিসেবে জানি। বিজ্ঞানীদের মতে তড়িৎ চুম্বকীয় বল ছাড়া আরও তিনটি প্রাকৃতিক বল রয়েছে, তাদের নাম প্রবল বল (Strong Force), দুর্বল বল (Weak Force) এবং আমাদের চিরপরিচিত মাধ্যাকর্ষণ বল (Gravitational Force)। প্রবল বলের প্রভাব কেবলমাত্র পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এর প্রভাবেই নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটনকণাগুলি একই চার্জ বা আধানযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক বিকর্ষণের ফলে আলাদা হতে পারে না, একসঙ্গে অবস্থান করে। দুর্বল বলের প্রভাব একটু ভিন্ন ধরনের। এই বলের প্রতিক্রিয়ার দরুনই তেজস্ক্রিয় পরমাণুর নিউক্লীয়াস কিছুটা শক্তিক্ষরণ করে স্থায়ী বা স্থিতিশীল নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হয়।

বিজ্ঞানীদের অনেক দিনের ধারণা যে বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্বের মত বাকি প্রাকৃতিক বলগুলিও আসলে একই মৌলিক বলের বিভিন্ন রূপ। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা এর কোনও সঠিক তাত্ত্বিক ভিত্তি খুঁজে পাননি। অবশেষে ষাট ও সত্তরের দশকে সাফল্যের আলো দেখা যায়। তিনজন বিজ্ঞানী, আবদাস সালাম, স্টিভেন ভিনবার্গ ও শেলডন গ্ল্যাশো প্রমাণ করেন যে পরমাণুর কেন্দ্রে যে দুর্বল বল সক্রিয় অবস্থায় দেখা যায় তার চরিত্র তড়িৎ চুম্বকীয় বলের মতই। তাঁরা ঐ একীকৃত বলের নাম রাখেন Electroweak Force। এ গবেষণার জন্য আলাম, ভিনবার্গ ও গ্ল্যাশোকে 1979 সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে তড়িৎচুম্বকীয় বল বিস্তারিত হয় 'ফোটন' কণার মাধ্যমে। সুতরাং Electroweak Force'এর বিস্তারণের জন্যেও কোনও কোনও মাধ্যম থাকা উচিত। তাও খুঁজে পাওয়া গেল 1983 সালে 'W' ও 'Z' নামক দুটি নতুন কণিকার রূপে। এই আবিষ্কারের জন্য ইতালীয় পদার্থ বিজ্ঞানী কার্লো রুবিয়া পেলেন 1984 সালের নোবেল পুরস্কার।

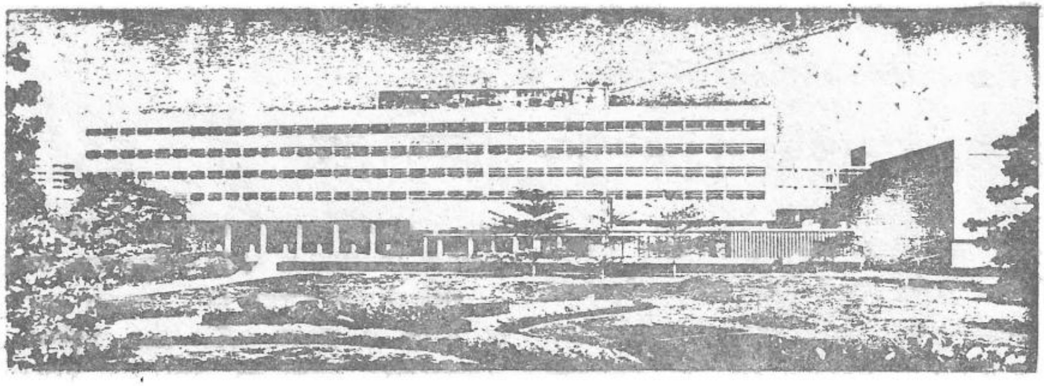

টাটা ইনস্টিটিউট অব্ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ

Electroweak বলের ভিত্তিতে W ও Z কণিকার অস্তিত্ব ছাড়া আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞানীরা করেছিলেন, তা হলো প্রোটন কণিকার ক্ষয়। তাঁদের মতে, যদি electroweak বল বাস্তব হয় তাহলে প্রোটন কণিকা চিরস্থায়ী হতে পারে না, তার ক্ষয় হবে, যদিও ঐ ক্ষয়ের হার খুবই নগণ্য। তোমরা হয়ত শুনে অবাক হবে যে যদিও এ বিষয় নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা বিশ্বের অন্যান্য দেশে চালানো হয়েছে, এনিয়ে প্রথম পরীক্ষামূলক গবেষণা শুরু হয় ভারতে, 'টি. আই. এফ. আর'-এর কোলার স্বর্ণ-খনির ভূগর্ভস্থ গবেষণাগারে। প্রোটনকণার ক্ষয় অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে 1980 সালে এখানে মাটির প্রায় আড়াই কিলো-মিটার নিচে পরিত্যক্ত এক খনিতে বসানো হয় এক বিশেষ সন্ধানী যন্ত্র। 'টি. আই. এফ. আর' এবং জাপানের টোকিও ও ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ সহযোগিতায় চালানো ঐ পরীক্ষায় ইতিমধ্যেই বেশ আশাজনক ফল পাওয়া গেছে, তবে প্রোটন ক্ষয়ের কোনও নিশ্চিত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি।

কোলার স্বর্ণখনিতে টি. আই. এফ. আর-এর বিজ্ঞানীরা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন গত দশ বছর ধরে। গবেষণার বিষয় অতি উচ্চশক্তি সম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মি। তোমরা হয়ত জানো যে মহা-কাশের বিভিন্ন দিক থেকে নানা রকম শক্তিশালী কণিকা ক্রমাগত পৃথিবীর ওপর এসে পড়ছে। এদের মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রন ও প্রোটন কণিকা ছাড়াও বিভিন্ন রকমের হালকা ও ভারি আয়ন। এসব কণিকার সমষ্টিকেই আমরা মহাজাগতিক রশ্মি বলে জানি। কোলার স্বর্ণখনিতে গবেষণার জন্য মাটির ওপরে এবং মাটির নিচে বিভিন্ন গভীরতায় বিশেষ যন্ত্র লাগানো হয়েছে যাতে বিভিন্ন শক্তির মহাজাগতিক রশ্মিকণা ধরা পড়ে। এখানে পরীক্ষার ফলাফল থেকে মহাজাগতিক রশ্মির প্রাথমিক গঠন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে।

মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা চালানো হয় গত বছর 'অনুরাধা' নামক যন্ত্রটি মহাকাশে পাঠিয়ে। 'অনুরাধা' যদিও বিভিন্ন সংস্থার এক যৌথ প্রচেষ্টা ছিল, তার পরিকল্পনা এবং সঞ্চালনে টি. আই. এফ. আর-এর বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ঐ পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল মহাজাগতিক রশ্মির অতি নিম্নশক্তি সম্পন্ন অংশের অধ্যয়ন করা। সাধারণতঃ মহাজাগতিক রশ্মির এ অংশটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে পারে না। আমেরিকার স্পেস শটলে চড়ে সাতদিন মহাকাশে কাটানোর পর 'অনুরাধা'কে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তার বিভিন্ন যন্ত্রে মহাজাগতিক কণার যে সব রেখা-চিহ্ন ধরা পড়েছে তার অধ্যয়ন করে এবিষয় অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

'টি. আই. এফ. আর' এর গণিত বিভাগে যে সব বিষয় নিয়ে গবেষণা চালানো হয় তার মধ্যে রয়েছে বীজগণিত, বীজগাণিতিক জ্যামিতি, সংখ্যাতত্ত্ব, সাংখ্যিক বিশ্লেষণ, সম্ভাব্য পদ্ধতি (Stochastic process) ইত্যাদি। তাছাড়া বিখ্যাত ভারতীয় গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজমের কিছু অপ্রকাশিত কাজ নিয়েও এখানে গবেষণা চালানো হয়েছে।

'টি. আই. এফ. আর'-এর নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এক মহত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল 1977 সালে কলকাতার সল্টলেকে ভেরিয়েবল্ এনার্জি সাইক্লোট্রন যন্ত্রের উদ্ঘাটন। ঐ যন্ত্রটি চালু হওয়ার পর তাতে ভারি আয়ন ত্বরিত করে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অধ্যয়নের সুযোগ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উচ্চমানের গবেষণা ছাড়াও 'টি. আই. এফ. আর'এর প্রতি বছর কয়েকটি ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা হয় যাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা যোগদান করেন। এছাড়া প্রতি বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে জাতীয় সায়েন্স ট্যালেণ্ট সার্চ বৃত্তিপ্রাপ্ত স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ বক্তৃতামালা এবং আলোচনাচক্রের আয়োজনও করা হয়।

7-UF কলেজ রোড, নিউ দিল্লী-1

জানা-অজানার নানা খবর

রেবতী ভূষণ

হাট্টিমাটিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিঙ
তারা হাট্টিমাটিম টিম

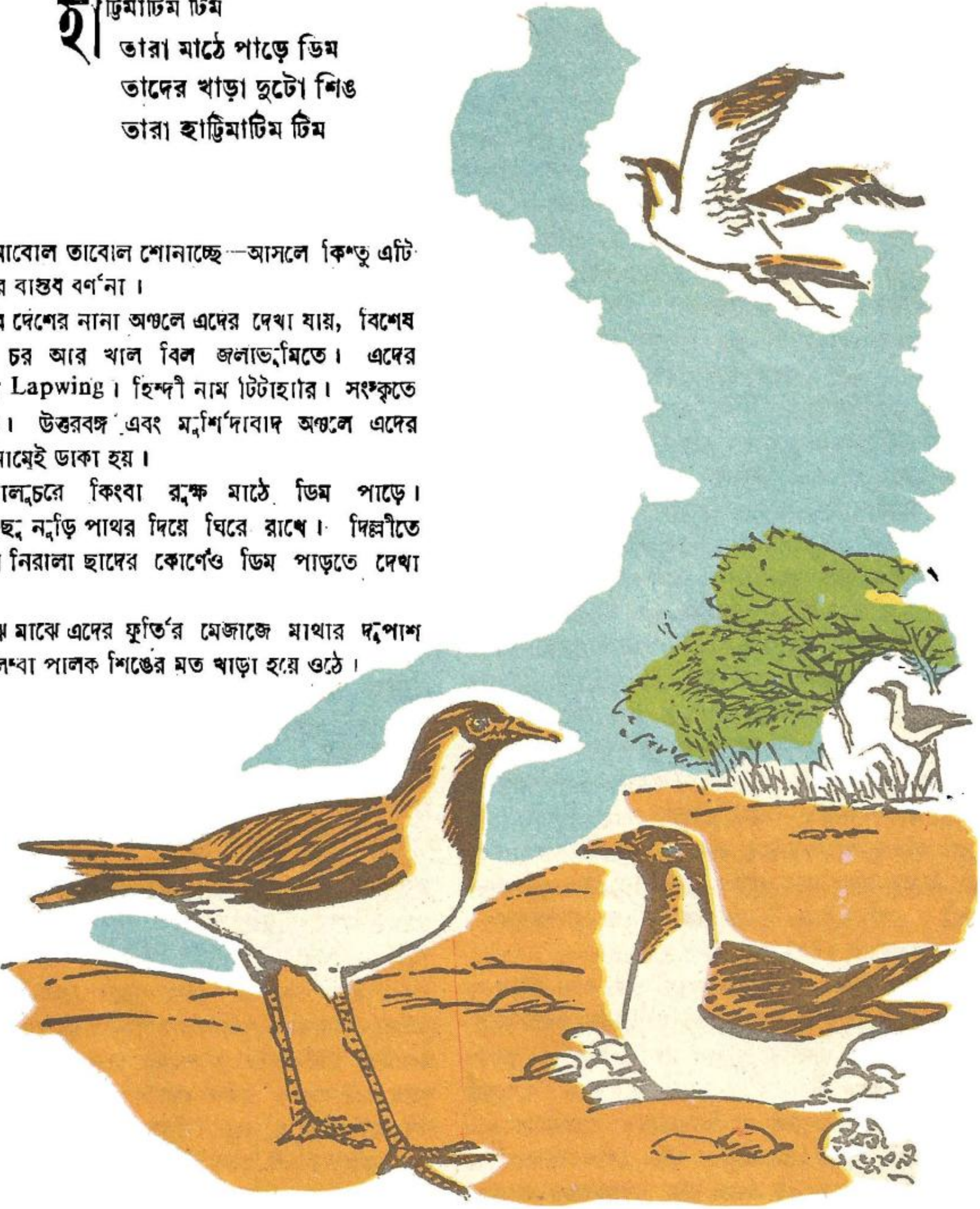

ছড়াটা আবোল তাবোল শোনাচ্ছে—আসলে কিন্তু এটি একটি পাখির বাস্তব বর্ণনা।

আমাদের দেশের নানা অঞ্চলে এদের দেখা যায়, বিশেষ করে নদীর চর আর খাল বিল জলাভূমিতে। এদের ইংরিজী নাম Lapwing। হিন্দী নাম টিটাহার। সংস্কৃতে বলে টিট্টিভ। উত্তরবঙ্গ এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এদের হাট্টিমাটিম নামেই ডাকা হয়।

এরা বালুচরে কিংবা রুক্ষ মাঠে ডিম পাড়ে। জায়গাটা কিছু নুড়ি পাথর দিয়ে ঘিরে রাখে। দিল্লীতে এদের বাড়ির নিরালা ছাদের কোণেও ডিম পাড়তে দেখা গেছে।

মাঝে মাঝে এদের ফুর্তির মেজাজে মাথার দুপাশ থেকে সরু লম্বা পালক শিঙের মত খাড়া হয়ে ওঠে।

চীনে এলেন মার্কোপোলো

1298-এর শরৎকাল। একজন মাঝবয়েসী ভেনিসিয় যুদ্ধবন্দী রয়েছেন জেনোয়ার ছেলে। তাঁর নাম মার্কো পোলো। মার্কো জেলখানায় বসে বসে একদা তিনি কুবলাই খানের দেশে যে অভিযান চালিয়েছিলেন, সেইসব আশ্চর্য কাহিনী বর্ণনা করেন। মোঙ্গলদের সম্রাট কুবলাই খানের সেই দেশ স্বপ্ন স্বপ্ন। সব কিছুই তার অবাক হওয়ার মতো। মানুষজন আসে তাঁর কাছে এই অবাক হওয়ার কাহিনী শুনতে। জেনোয়ায় ক্রমশ খবর ছড়ায়। মার্কো বলেন, সেই আদর্শ দেশে সোনার মন্দির, চুণির খনি, কুবলাই খানের বিশাল প্রাসাদের গল্প।

মার্কোর সঙ্গে রুস্তিচেল্লো নামে একজন পেশাদার লেখক ছিলেন। তিনি পিসার বাসিন্দা। মার্কোর এইসব কাহিনী শুনে উল্লসিত রুস্তিচেল্লো। তিনি কুবলাইখানের দেশে অভিযানের নোট বই ভেনিস পাঠাতে বললেন মার্কোকে। এইসব গল্প আর নোট বইয়ের মালমশলা মিলিয়ে রুস্তিচেল্লো 1299 সালে তৈরি করলেন এক পাণ্ডুলিপি—এটা তৈরি হয়েছিল মার্কো পোলো জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগেই। কয়েক দিনের ভেতরই সমস্ত ইউরোপে নানা ভাষায় অনুবাদ হয়ে হুড়মুড় করে ছড়িয়ে পড়ল এই লেখা। প্রথমে বইটিকে শুধুমাত্র 'এ ডেসক্রিপশান অফ দি ওয়ার্ল্ড'' বলা হত। কারণ এই সময়ের আর কোন বইতে পৃথিবীর এত বিস্তারিত বিবরণ ছিল না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বইটি পরিচিত হয়ে উঠল 'দি বুক অফ মিলিওনে অ্যাবাউট দি ওয়ানডার্স অফ দি ওয়ার্ল্ড'।' এই বইতে পোলো দিয়েছিলেন কুবলাই খানের সম্পদ আর রাজস্ব রোজগারের এক ভুয়ো বিবরণ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই ইউরোপ যখন অন্ধকার যুগের আবরণ সরিয়ে নিকট প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাইছে, জনসংখ্যা বেড়ে ওঠার ফলে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন শহর। জন্ম নিয়েছে নতুন বণিক শ্রেণী। ভেনিস হয়ে উঠেছে এক প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। আর এই শহরেই 1254 সালে জন্ম মার্কোর।

মার্কোর জন্মের কয়েক মাস আগে তাঁর বাবা নিকোলা এবং কাকা ম্যাফেও ব্যবসা করতে গেছিলেন কনস্ট্যানটিনোপল। তারা দুজনেই ছিলেন রত্ন ব্যবসায়ী। আরও কয়েক বছর বাদে তাঁরা পেঁছে গেলেন বুখারা। বুখারার শাসনকর্তা ছিল মোঙ্গল বা তাতাররা। পোলোরা দুই ভাই এখানে ছিলেন তিন বছর। তাঁরা বেশি ঘোরাঘুরির সাহস পাননি, কারণ এই অঞ্চলে ছিল ডাকাতদের উপদ্রব। শেষে স্থানীয় একজন রাজা নিকোলো এবং ম্যাফেওকে আহ্বান জানালেন—চলুন, আমার সঙ্গে কুবলাই খানের দরবারে।

নিকোলো এবং ম্যাফেও দেখলেন দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যের এই তো সুযোগ। আরব আর পারসি বণিকদের এড়িয়ে কাজ করতে পারলে লাভ অনেক। এই ভেবে তাঁরা রাজি হয়ে গেলেন ঐ প্রস্তাবে।

1285 সালে এক দুঃসহ পরিশ্রমের পর নিকোলো এবং ম্যাফেও কুবলাই খানের দরবারে পেঁছলেন। চেঙ্গিস খানের নাতি এই বিখ্যাত সম্রাটের দরবারে প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে উপস্থিত হলেন তাঁরা।

প্রকৃতি-প্রেমিক মার্কো পোলো লক্ষ্য রাখছেন চারদিকে। বিবরণ লিখে রাখছেন অভিযানের। ঝর্ণা, পাখি, প্রাকৃতিক দৃশ্য দূর করে দিচ্ছে তাঁর পরিশ্রমের ক্লান্তি। খৃস্টান ও মুসলমান ধর্মযোদ্ধাদের এড়িয়ে তাঁদের ছোট ক্যারাভান চলেছে উত্তরে। কৃষ্ণ সাগরের কাছে এসে তাঁরা চললেন পূর্বে। আরারাত পর্বতের কোল ঘেঁষে তাঁদের যাত্রা। শোনা যায়, এখানেই বিশ্রাম করতে থেমেছিল নোয়ার নৌকো। তারপর রুশ জর্জিয়ার পার্বত্য প্রদেশে। এই গোটা অঞ্চলটাই ইউরোপীয় বণিকদের জানা। কিন্তু মার্কোর কাছে সবই নতুন। তিনি এখানে দেখলেন তেলের ঝরনা, যেখান থেকে হু হু করে বেরিয়ে আসছে তেল। মার্কো লক্ষ্য করলেন এই তেল কিন্তু খাওয়ার কাজে লাগে না, ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় উট আর মানুষের জন্য।

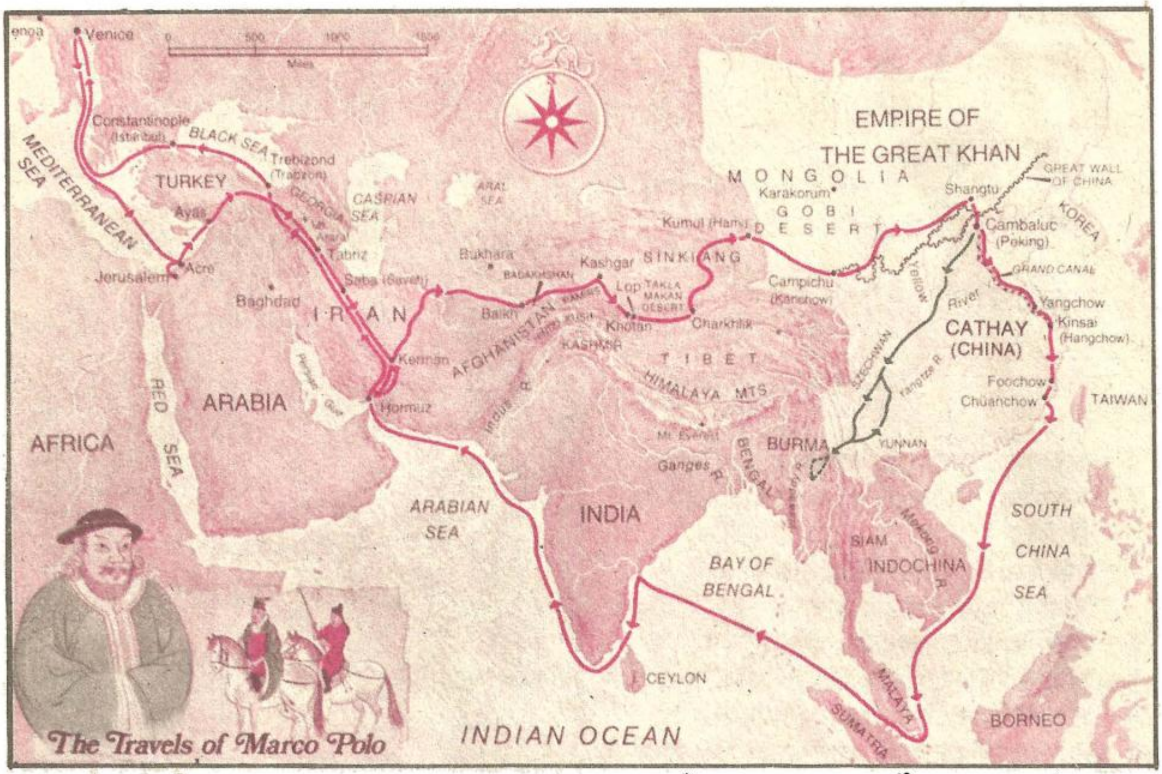

The Travels of Marco Polo

দুর্গম অঞ্চল দিয়ে চলতে লাগলেন পোলোরা। পথের কষ্ট খুব। রোজ দশ থেকে কুড়ি মাইল চলে ক্যারাভান। কখনও তুষার শীতল পার্বত্য অঞ্চল, কখনও পাথুরে মরুভূমি পেরিয়ে যাওয়া। গনগনে গরম নোনা সমুদ্রখাত পেরনোর সময় খাওয়ার জল নেই। কিরমানে পেঁছে তাঁরা ঠিক করলেন সমুদ্রপথে চীনে যাবেন। তাঁরা গেলেন হরমুজে। হরমুজ হলো পারস্য উপসাগরের একটি বন্দর। যেসব গ্রাম চোখে পড়ল সেখানে কাদার বড় উঁচু দেয়াল তোলা। Karaunas নামের দস্যুদের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই এই ব্যবস্থা। Karaunas দস্যুরা মার্কোদের ক্যারাভানও আক্রমণ করেছিল। সব দেখেশুনে মন পাল্টে ফেললেন তাঁরা। ধরলেন সিল্ক রোড। পেঁছেলেন উত্তর আফগানিস্তানের বলখে। একসময় বলখ ছিল শ্বেত পাথরের প্রাসাদ নগরী। প্রাচীন ব্যাকট্রিয়ার রাজধানী। এখানেই আলেকজান্ডার বিয়ে করেছিলেন পারস্যের সম্রাট দারিয়ুসের মেয়েকে। ভেনিসের মানুষেরা এখানে শুধুই ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলেন, যা পঞ্চাশ বছর আগে চেঙ্গিজ খানের আক্রমণের ফলে হয়েছে।

বলখ পেরিয়ে মার্কোরা পেঁছলেন বাদাখশানে। হিন্দুকুশের এই অঞ্চলে অসংখ্য চুণি'র খনি।

বিশাল এ মরুভূমি পেরোতে সময় লেগেছিল এক মাস। তখনকার দিনে বিশ্বাস ছিল এই মরুভূমি অশুভ আত্মায় ভর্তি। কিন্তু মার্কোদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

তারপর ওঁরা ঢুকে পড়লেন মঙ্গোলিয়ায়। মার্কো সেখানে পেয়েছিলেন বুদ্ধমূর্তি। তিনি লিখেছিলেন, 'তাতাররা রেশম ও সোনার পোশাক পরে, তাতে থাকে সেবলের চামড়া, আরও অন্যান্য জন্তুর চামড়াও।

8000 মাইল পেরিয়ে পোলোরা প্রায় তাঁদের গন্তব্যস্থলে পেঁছলেন। ভেনিস ছেড়েছেন প্রায় তিন বছর। আরও চল্লিশ দিন চললে কুবলাই খানের দেখা পাওয়া যাবে—এমন একটা খবর পাওয়া গেল। কুবলাই খান তাদের আরাম ও যত্ন আত্তির ব্যবস্থা করলেন পথের সর্বত্র।

অবশেষে 1275 সালের গ্রীষ্মে মঙ্গোল শহর শাংতুতে ঢুকে পড়লেন তাঁরা। সেখানে গ্রীষ্ম-প্রাসাদে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন কুবলাই খান। তখন কুবলাই খানের বয়স 60। সুন্দর মজবুত চেহারা। সোনার কাজ করা রেশমের পোশাক তার পরনে। সমীহ জাগানো আভিজাত্যপূর্ণ চলাফেরা। কুবলাই খানের সামনে মার্কোকে নিয়ে এসে নিকোলো বলেছিলেন, 'এই আমার ছেলে। আপনার দাস।'

কুবলাই খান তার উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি ওকে স্বাগত জানাচ্ছি। ওকে দেখে আমিও খুশি।'

1এ মুখার্জি পাড়া লেন, কল-26

কিন্নর রায়

সিনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট জুলাই '86

1. কবে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ?
2. অনুশীলন সমিতির সভাপতি ও প্রধান নায়ক কে ছিলেন ?
3. ঢাকা শহর কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত ?
4. 'বক্সাইট' কোন্ ধাতুর আকরিক ?
5. সুঁদরী গাছের কি রকম মূল থাকে ?
6. মিটারের 10^9 ভাগকে কি বলা হয় ?
7. 'কক' স্কুইজার' কোন্ শ্রেণীর লিভার ?
8. ভলিবল নেট-এর দৈর্ঘ্য এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে কতো ?
9. সাধারণ নির্বাচনে ভারতের রাষ্ট্রপতির ভোটাধিকার আছে কি ?
10. বরফ গলনের লীনতাপ কতো ?
11. অ্যামিবার জনন পদ্ধতি যৌন না অযৌন ?

May 1986-এ প্রকাশিত সিনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সমাধান।

1. সিধু ও কানহু। 2. শতদ্রু নদীর উপর নির্মিত ভাকরা বাঁধ। 3. বক্সাইট। 4. বৃটেনের জাতীয় পাখি 'রবিন'। 5. সবাত শ্বসনে। 6. রিয়াধ। 7. হিমোসায়ানিন। 8. Nacl. 9. আর্গা/সেকেণ্ড। 10. এর নাম 'ক্যাটকিন'। বার্চ, হ্যাজেল, অলডার প্রভৃতি গাছের ফুল এই নামে অভিহিত হয়। 11. 1·62 আউন্স। 12. পতঙ্গ

ফোটো ক্যুইজ

মানুষের বিজ্ঞান প্রতিভার এক অপূর্ব নিদর্শন নিচের বস্তুটি। এর নাম কি ?

আদ্যিকালের এই ঘড়িটি কোথায় গেলে দেখতে পাবে ?

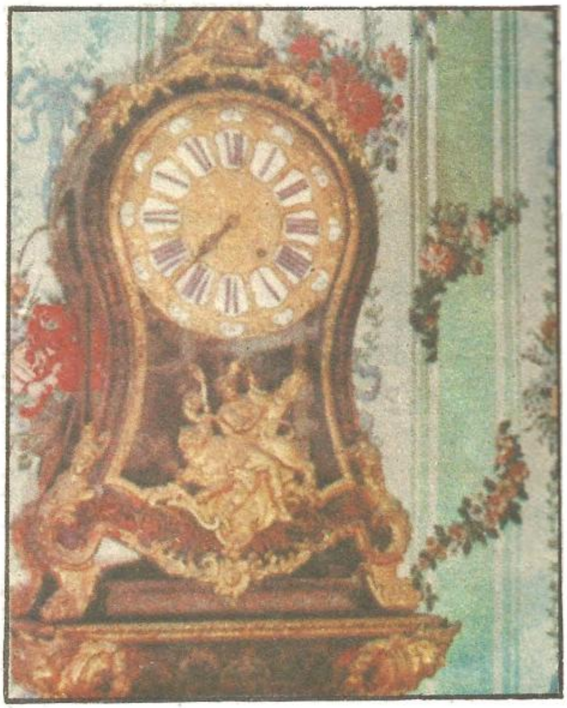

পদার্থ বিজ্ঞানের কথা

অজয় চক্রবর্তী

এবার দেখা যাক, নিউটনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূত্র থেকে কেমন করে রৈখিক ভরবেগের সূত্রটি পাওয়া যায়। ক্যারাম খেলার সময় স্ট্রাইকার যখন এসে ঘুটির ওপর আঘাত করে তখন স্ট্রাইকার ঘুটির ওপর যে বল প্রয়োগ করে—ঘুটিও স্ট্রাইকারের ওপর সমান বল প্রয়োগ করবে। তবে, স্ট্রাইকারের ওপর ক্রিয়াশীল বল এবং ঘুটির ওপর ক্রিয়াশীল বল হবে পরস্পর বিপরীতমুখী। কাজেই ঘুটির ওপর ক্রিয়াশীল বল F হলে স্ট্রাইকারের ওপর ক্রিয়াশীল বল হবে −F। আলোচ্য সংঘাতের ফলে স্ট্রাইকার এবং ঘুটি—উভয়েরই ভরবেগের পরিবর্তন হবে। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা লিখতে পারি,

$$\frac{\text{ঘুটির ভরবেগের পরিবর্তন}}{\text{সংঘাত-কাল}} = F$$

এবং $$\frac{\text{স্ট্রাইকারের ভরবেগের পরিবর্তন}}{\text{সংঘাত-কাল}} = -F$$

উপরের সমীকরণ দুটো যোগ করে লেখা যায়,

$$\frac{\text{ঘুটির ভরবেগের পরিবর্তন} + \text{স্ট্রাইকারের ভরবেগের পরিবর্তন}}{\text{সংঘাত-কাল}} = 0$$

বা, ঘুটির ভরবেগের পরিবর্তন + স্ট্রাইকারের ভরবেগের পরিবর্তন $= 0$

কাজেই, স্ট্রাইকার আর ঘুটিকে একত্রে বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, পারস্পরিক সংঘাতের ফলে এদের ভরবেগের কোন তারতম্য ঘটছে না। সংঘাতকালে স্ট্রাইকার এবং ঘুটি—এদের উভয়েরই ভরবেগের পরিবর্তন হয় সত্য, কিন্তু এদের মোট ভরবেগ অপরিবর্তিতই থাকে। লক্ষণীয় যে, 'স্ট্রাইকার-ঘুটি' সংস্থার ওপর কোন বাহ্যিক বল এক্ষেত্রে ক্রিয়া করছে না – যে-বল স্ট্রাইকার এবং ঘুটির ওপর ক্রিয়া করছে তা এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বল স্ট্রাইকার-ঘুটি সংস্থার অভ্যন্তরীণ বল মাত্র। এরূপ ক্ষেত্রে সংস্থার ভরবেগের কোন পরিবর্তন হয় না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কোন সংস্থার ওপর বাহ্যিক বল ক্রিয়া না করলে ঐ সংস্থার ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে। এ উক্তিটিই রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র। কেবল দুই বস্তুতে গঠিত সংস্থার ক্ষেত্রেই নয়, বহু বস্তুর সমবায়ে গঠিত সংস্থার ক্ষেত্রেও একথা সত্য।

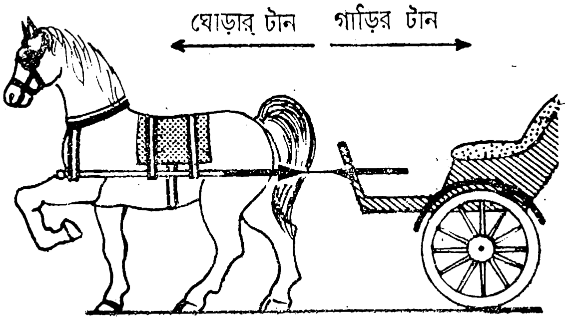

এবার ঘোড়ার গাড়ি-টানা প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। গাড়ির ওপর ঘোড়ার টান আর ঘোড়ার ওপর গাড়ির টান—এ দুই বল ঘোড়াসহ গাড়ির অভ্যন্তরীণ বল মাত্র। এদের কোনটিই উক্ত সংস্থার বাহ্যিক বল নয়। কাজেই, এই দুই বলের যুগপৎ ক্রিয়ায় ঘোড়াসহ গাড়িতে ভরবেগ সঞ্চারিত হতে পারে না। ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ঘোড়ার টানে আদৌ ঘোড়ার গাড়ি চলছে না। স্থির ঘোড়ার গাড়িকে সচল করতে হলে ঘোড়াসহ গাড়ির ওপর বাহ্যিক বল ক্রিয়া করতে হবে। সুতরাং, প্রশ্ন উঠবে যে, 'কোন বাহ্যিক বলের ক্রিয়ায় ঘোড়ার গাড়ি চলে?'

তোমরা শুনলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবে যে, ঘোড়ার টানে গাড়ি চলে না, গাড়ি চলে ভূমির ঠেলা খেয়ে। ভূমি কেবল গাড়ির চলার জন্য বুক পেতেই রাখে নি, গাড়িতে গতি সঞ্চারিতও করছে ভূমি। ঘোড়া যখন পা দিয়ে ভূমিতে তির্যগ্‌ভাবে বল প্রয়োগ করে, ভূমিও তখন ঘোড়ার ওপর তির্যগ্‌ভাবে প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে। ভূমির এ প্রতিক্রিয়া গাড়ি-ও-ঘোড়ার ওপর বাহ্যিক বল। এ বলের জন্যই গাড়ি নিয়ে ঘোড়া এগোতে পারে।

সায়েন্স কলেজ, কল 9

'ধূমকেতু' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

পল্লী নক্ষত্রবিদ রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের 108তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'ধূমকেতু' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্তরের সব ছাত্রছাত্রী যোগদান করতে পারবে। এ বিষয়ে বিস্তৃত নিয়মাবলীর জন্য : সম্পাদক, রাধাগোবিন্দ চন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি, সত্যভারতী ভবন, পোঃ নবপল্লী, বারাসাত। উত্তর 24 পরগনা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

আবিষ্কারের কাহিনী
(১ম, ২য়, ৩য় একত্রে)
সুধাংশু পাত্র দাম : 25·00
পাত্রজ পাবলিকেশনস্‌, কল-73।

এ কালের বিজ্ঞান লেখকদের মধ্যে সুধাংশু পাত্র একটি সুপরিচিত নাম। বিগত কয়েক বছরে ছোটদের জন্যে লেখা তাঁর বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচনার জন্য আমার হাতে তাঁর লেখা যে বইটি এসেছে তার নাম 'আবিষ্কারের কাহিনী' (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড একত্রে); এতে মোট একশো সাতটি বিজ্ঞান বিষয়ক আবিষ্কারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন সুধাংশু বাবু। এইসব আবিষ্কারের কাহিনীর মধ্যে অন্যতম হলো ঘড়ি, সেলুলয়েড, পেনিসিলিন, মোটর গাড়ি রকেট, ট্রানজিস্টার, টেরিলিন, কাগজ, রাডার, লেসার রশ্মি, দিয়াশলাই ও আরও কতো কি? সুধাংশু বাবুর রচনার বৈশিষ্ট্য হলো সহজ ও সরল ভাষায় বক্তব্যকে উপস্থাপন করা। তাই আবিষ্কারের এই কাহিনীগুলি কিশোর কিশোরীদের পড়তে তো ভাল লাগবেই, সেই সঙ্গে তাদের জ্ঞানের পরিধিও অনেক বাড়বে। এ দিক থেকে বিচার করলে সুধাংশুবাবুর লেখা এই গ্রন্থখানি খুবই মূল্যবান। মূলতঃ ছোটদের জন্যে লেখা হলেও এই বইখানি পড়ে বড়দেরও ভাল লাগবে। তাঁরাও জানতে পারবেন অনেক অজানা তত্ত্ব ও তথ্য। সুধাংশু বাবুর প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু মস্ত বড় একটা ত্রুটি রয়ে গেছে। পঁচিশ টাকা মূল্যের তিনশো ছিয়াত্তর পৃষ্ঠার বইখানির মধ্যে একটিও ছবি নেই, অথচ ছবি ছাপার অনেক সুযোগ ছিল। কিছু কিছু ছাপার ভুলও রয়ে গেছে। ভবিষ্যতে ছবি দিয়ে ও ছাপার ভুলগুলি সংশোধন করে পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হতে দেখলে খুশি হব। **অমরনাথ রায়**

বিজ্ঞান চর্চায় প্রাচীন ভারত ও সমকালীন অন্যান্য দেশ
সুধাংশু পাত্র
বাণীশিল্প—কলকাতা-9 দাম : 20·00

সভ্যতার যে সিঁড়ি বেয়ে মানব সভ্যতার ধাপে ধাপে উঠে আসা, তার প্রায় প্রত্যেকটি পদক্ষেপের অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক টেনে এনেছেন মানুষের যে এগিয়ে চলা, তার ধারাবাহিক ইতিহাস। ভারতবর্ষ নামের যে দেশটির আমরা অধিবাসী, তার প্রাচীন বিজ্ঞান ভাবনা, বিজ্ঞান চর্চা এবং বিজ্ঞান মনীষার কথা লেখক হাজির করেছেন পরম যত্নে। বহু অজানা বিবরণ পড়তে পড়তে চমকে উঠি। এই ভারত ভূখণ্ড চিকিৎসা, প্রযুক্তি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে কতটা উন্নত ছিল তা জেনে বার বার রোমাঞ্চিত হতে হয়।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল বিবরণের পাশাপাশি লেখক জানান অনেক আশ্চর্য তথ্য। বিশেষ করে ঘোষার কুষ্ঠরোগ মুক্তি এবং যুদ্ধে খোয়া যাওয়া রাজা ঋজ্রাশ্বর পায়ের জায়গায় লোহার নকল পা লাগিয়ে দেয়ার তথ্য আমাদের শুধু বিস্মিত এবং মুগ্ধই করে না, প্রাচীন বিজ্ঞানীদের সামনে নতজানু হওয়ার সাহস যোগায়। এমনি আরও অনেক অবাক করা খবর। পারাকে সোনায় পরিণত করার জন্যে ভারতীয় কিমিয়া-বিদদের প্রচেষ্টাকে লেখক পর্যবেক্ষণ করেছেন বিজ্ঞান-সচেতন মন নিয়েই। তিনি বলেছেন, 'তবে একটা আশ্চর্যের কথা, মধ্যযুগে কিমিয়াবিদরা কেন পারদকে সোনা বানাবার চেষ্টা করেছিলেন? আজকের উন্নত রসায়নে আমরা দেখতে পাচ্ছি পারদের পরমাণু ক্রমাঙ্ক 80। অপরদিকে সোনার পরমাণু ক্রমাঙ্ক 79। পারদ পরমাণুর কেন্দ্রক অপেক্ষা সোনার পরমাণু কেন্দ্রকে (নিউক্লিয়াসে) মাত্র একটি প্রোটন কম থাকে। যদি কোনও প্রকারে পারদ পরমাণুর কেন্দ্রক থেকে মাত্র একটি প্রোটনকে বিচ্যুত করা যায় তাহলে সেটি আর পারদ থাকবে না—সোনাতেই পরিণত হবে। বর্তমানে এই উপায়ে সোনা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।' (পৃ-170)

ভারতবর্ষসহ বিভিন্ন দেশের পুরাণ কথাকেও লেখক বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞান-মনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। পুরাণের গল্পগুলি থেকে মানুষের উৎপত্তি এবং এগিয়ে চলার ইতিহাসের মূল সুরটি ধরতে চেয়েছেন। তাঁর কৃতিত্ব এখানেই। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি তিনি তুলে ধরেছেন কিছু দুষ্প্রাপ্য এবং অধুনালুপ্ত পুঁথি-পুস্তকের কথা। যেগুলি আকরগ্রন্থ হিসেবে অবশ্য উল্লেখের দাবি রাখে। এই তালিকা থেকে অনুসন্ধিৎসুরা উপকৃত হবেন।

183 পাতার এ বইটিতে লেখক পর্যায়ক্রমে যে সব তথ্য দিয়ে গেছেন, তা নিঃসন্দেহে সাধারণ এবং বোদ্ধা—দু শ্রেণীর পাঠকের কাছেই মূল্যবান সামগ্রী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল। তবে বইয়ের শেষ পর্যায়ে তিনি ধর্ম এবং বিজ্ঞানকে একসঙ্গে মিলিয়ে ফেলার যে কথা বলেছেন, তা ধর্মান্ধ কায়েমী স্বার্থের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি? তারা তো চিরকালই ধর্মের দোহাই দিয়ে বিজ্ঞানকে হত্যা করতে চেয়েছে। বইয়ের একেবারে শেষে লেখক 'ধর্ম' বলতে কোন 'ধর্মে'র কথা বলেছেন? তা কি মানবিকতার অন্য নাম?

কিন্নর রায়

[দুই]

রসায়ন ও তার ভাষা

অমরনাথ রায়

রসায়ন বিজ্ঞানের জন্মকথা আমরা আগের সংখ্যার প্রথম অধ্যায়ে জেনেছি। আমাদের এই জড়জগৎ অগণিত বিচিত্র বস্তু দিয়ে গড়া। জড় জগৎ যে সব পদার্থ দিয়ে গড়া তাদের ধর্ম, গুণাবলী, গঠন, শক্তি প্রয়োগে তাদের কি রকম পরিবর্তন ঘটে, এক পদার্থের সঙ্গে অন্য পদার্থের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেমন হয়—এ সবই রসায়ন বিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। আলোচনার সুবিধার জন্যে রসায়ন বিজ্ঞানকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—অজৈব রসায়ন, জৈব রসায়ন ও ভৌত রসায়ন। যতই দিন যাচ্ছে, অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে তাল রেখে রসায়ন বিজ্ঞানের পরিধিও বিস্তৃত হচ্ছে। শাখা-প্রশাখা মেলে রসায়ন বিজ্ঞান বেড়ে চলেছে। তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে কৃষি-রসায়ন, শিল্প-রসায়ন, বৈশ্লেষিক রসায়ন, ভেষজ রসায়ন ও পেট্রোলিয়ম রসায়ন।

বিজ্ঞানের সব শাখার মতই রসায়ন বিজ্ঞানেরও নিজস্ব ভাষা আছে। রসায়ন বিজ্ঞান পড়তে গেলে সে ভাষা জানা দরকার। আগেই বলেছি যে রসায়ন শাস্ত্রে পদার্থের গঠন ও নানারকম রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা পড়তে হয়। পদার্থদের সম্পূর্ণ নাম লিখে তাদের গঠন ও পরিবর্তনগুলিকে সর্বদা প্রকাশ করা অসুবিধাজনক। সেই অসুবিধা দূর করার জন্যে প্রাচীনকালের রসায়নবিজ্ঞানীরা নানারকম সাংকেতিক চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের নাম প্রকাশ করতেন। চিত্র সহযোগে কোন মৌলের নাম প্রকাশ পদ্ধতি শুধু জটিলই ছিল না, ছিল অসুবিধাজনকও। সেই অসুবিধাকে দূর করার কাজে প্রথম এগিয়ে আসেন ইংরেজ রসায়ন বিজ্ঞানী 'জন ডালটন' (1766-1844)। তিনি মৌলদের বোঝাবার জন্যে জটিল চিত্রের বদলে অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল চিহ্নের প্রবর্তন করেন। কিন্তু ডালটন প্রবর্তিত চিহ্নগুলিও সহজবোধ্য ছিল না এবং সেগুলি দ্বারা পদার্থের গঠন সুন্দরভাবে বোঝানো যেত না। তাই 1811 খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত সুইডিশ বিজ্ঞানী 'জোন্স জ্যাকব বার্জেলিয়াস' (1779-1848) সর্বপ্রথম একটি সহজ পদ্ধতির সাহায্যে মৌলিক পদার্থগুলির পূর্ণ নাম সংক্ষেপে প্রকাশের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। সেই পদ্ধতি নির্ভুল বলে আজও পৃথিবীর সব দেশে প্রচলিত আছে। বার্জেলিয়াসের পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে সব কটি মৌলিক পদার্থের চিহ্ন, একে অপরের থেকে আলাদা। তাহলে চিহ্ন বলতে আমরা বুঝব তাকে, যার দ্বারা কোন মৌলিক পদার্থের নাম সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। কোন কোন মৌলিক পদার্থের ইংরেজী নামের প্রথম অক্ষরটি বড় অক্ষরে (Capital letter) লিখলেই সেইসব মৌলের চিহ্ন পাওয়া যায়। যেমন হাইড্রোজেন (Hydrogen) এর চিহ্ন H, অক্সিজেন (Oxygen) এর চিহ্ন O, নাইট্রোজেন (Nitrogen) এর চিহ্ন N, বোরোন (Boron) এর চিহ্ন B, আয়োডিন (Iodine) এর চিহ্ন I এবং কার্বন (Carbon) এর চিহ্ন C. কিন্তু এমন অনেক মৌল আছে যাদের ইংরেজী নামের আদ্যক্ষর অভিন্ন। যেমন, কার্বন (Carbon) ও ক্লোরিন (Chlorine)—উভয়ের নামের আদ্যক্ষরই C. তাহলে কি হবে? বার্জেলিয়াস বললেন, কার্বনের চিহ্ন C থাক, আর ক্লোরিনের বেলায় নামের আদ্যক্ষরের (C) সঙ্গে আর একটি অক্ষর (l) যোগ করা হোক্। তাহলে ক্লোরিনের চিহ্ন Cl. ঐ একই নিয়মে ক্যালসিয়াম (Calcium) এর চিহ্ন হবে Ca এবং ক্যাডামিয়াম (Cadamium) এর চিহ্ন হবে Cd।—এই নিয়ম প্রয়োগ করেও সব মৌলের চিহ্ন স্থির করা গেল না। গোল বাধলো সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লেড, টিন ইত্যাদি মৌলের চিহ্ন স্থির করার বেলায়। বার্জেলিয়াম বললেন, এইসব মৌলের ক্ষেত্রে এদের ল্যাটিন নামের প্রথম অক্ষর বা প্রথম অক্ষরের সঙ্গে দ্বিতীয় বা আরেকটি অক্ষর যোগ করে চিহ্ন স্থির করতে হবে।—এই নিয়মে সোডিয়ামের ল্যাটিন নাম Natrium থেকে তার চিহ্ন স্থির হলো Na, পটাসিয়ামের ল্যাটিন নাম Kalium থেকে তার চিহ্ন স্থির হলো K এবং সিলভারের ল্যাটিন নাম Argentum থেকে তার চিহ্ন স্থির হলো Ag।

এমনিভাবে যাবতীয় মৌলিক পদার্থের চিহ্ন তো স্থির হলো, কিন্তু চিহ্নের তাৎপর্য কি?—চিহ্নের দ্বারা কোন মৌলিক পদার্থের নামকেই শুধু বোঝায় না, সেই মৌলের একটি পরমাণুকে এবং সেই পরমাণুর পারমাণবিক গুরুত্বকেও বোঝায়। তার মানে, O চিহ্ন লিখলে বুঝতে হবে এক পরমাণু অক্সিজেন এবং অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব 14।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে মোট 92টি প্রাকৃতিক সাধারণ মৌলিক পদার্থের পরিচয় রসায়ন বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। এরপর আরও এগারোটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি কিন্তু সাধারণ মৌলের পর্যায়ভুক্ত নয়। তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের ফলে কৃত্রিম উপায়ে ঐ সব মৌলিক পদার্থ রসায়ন বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করেছেন। এগুলির কোনটিই প্রকৃতিতে অবস্থান করে না। এরা সবাই ক্ষণস্থায়ী এবং এদের বলা হয় ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল। কাজেই এখনও পর্যন্ত $92 + 11 = 103$টি মৌলের পরিচয় বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। ভবিষ্যতে হয়তো আরও কিছু অজানা মৌলের সন্ধান মিলবে। বাড়বে, রসায়ন বিজ্ঞানের পরিধিও।

মজার ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্ট

পার্থসারথি চক্রবর্তী

কৃষ্ণনগর থেকে দাদু তাঁর নাতিকে চিঠি লিখছেন—'দিনের বেলায় বেজায় গরম, রাতের বেলায় মশা মাঝে মাঝে লোডশেডিং-এ বাড়ায় সে দুর্দশা।' সত্যি, লোডশেডিং-এর সময় কি দুর্দশাই না হয়, আমাদের তখন কোথায় মোমবাতি, কোথায় টর্চ, কোথায় দেশলাই বা লাইটার—এইসব হন্যে হয়ে খুঁজতে হয়।

দাদুর নাতি ভাস্কর দিনরাত ইলেকট্রনিক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করে। ডায়োড, ট্রানজিস্টর, ক্যাপাসিটর, LED—এইসব নিয়েই সে মশগুল হয়ে রয়েছে। চিঠিটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে দাদুকে একটা ব্যাটারির সাহায্যে জ্বলতে পারে এমন একটা টিউব লাইট তৈরি করে সে রবিবার কৃষ্ণনগরে হাজির। ভারী ছিমছাম, সুন্দর এই মডেলটি পেয়ে দাদুও খুব খুশি। এটা তৈরি করতে বিশেষ ঝামেলাও নেই। তোমরা যদি এটা তৈরি করতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে লেগে যাও কাজে। এটা তৈরি করতে খুব বেশি খরচও হবে না, অথচ এই লোডশেডিং-এর দুর্দশার দিনে খুবই কাজে আসবে। নিজের হাতে তৈরি ঘুড়ি যখন আকাশে ওড়ে, নিজের হাতে তৈরি বাঁশি যখন বেজে ওঠে তখন কি আনন্দই না হয়! এটা হচ্ছে সৃষ্টির আনন্দ। সেই রকম এই ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্ট তৈরি করে যখন আলো ঝলমলিয়ে উঠতে দেখবে তোমার মনও আনন্দে নেচে উঠবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

নিচের সার্কিটটা দেখেই তোমরা এই ব্যাটারি চালিত টিউব লাইট তৈরি করতে পারবে। এই অসিলেটর সার্কিটের প্রাণকেন্দ্র বা হার্ট হল AC 127 ট্রানজিস্টর। অবশ্য যে কোনও ট্রানজিস্টরেই তোমার কাজ চলবে। যদি তুমি PNP টাইপ ট্রানজিস্টর ব্যবহার কর তাহলে দেখবে এমিটর যেন পজিটিভ (+) এবং সেন্টার ট্যাগ যেন নেগেটিভ (–)-এ যায়; 5k পোটেনসিওমিটার বেস কারেন্টকে বদলে দিতে পারে, ফলে আলোর উজ্জ্বলতা কখনও কম আবার কখনও বা বেশি হবে।

এখানে একটা ব্যাপার অবশ্যই মনে রাখবে। তা হল ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি সেকশনের প্রান্তদেশ যখন 'অন' করা থাকবে তখন ওটা ছোঁবে না মোটেই। যদি অসাবধানতাবশতঃ কখনও ছুঁয়ে ফেল তাহলে জোর একটা ধাক্কা খাবার সম্ভাবনা আছে, অবশ্য সেটা খুব বিপজ্জনক নয়।

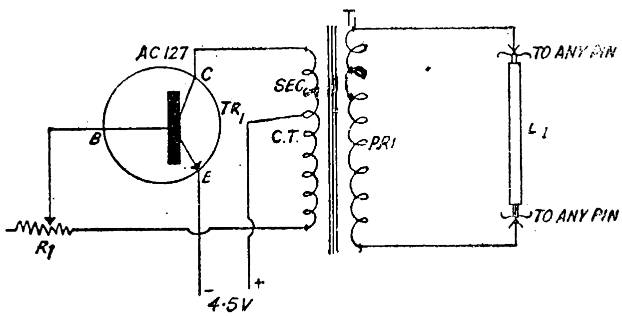

কি কি জিনিস চাই

R_1—পোটেনসিওমিটার, 5K ওহম। Trl ট্রানজিস্টর AC 127 (NPN) BEL; T_1—স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার; Pri : 230—250 ভোল্ট, সেকেন্ড : 6—0—6 ভোল্ট; L_1—10·6 in টিউব লাইট। ব্যাটারি 4·5 ভোল্ট, সলডার ইত্যাদি; সাধারণ ট্রানজিস্টরের বদলে Power transistors—OC 26, OC 27; AD 139, AD 149 ব্যবহার করা যেতে পারে জোরালো আলোর জন্য।

সংশোধনী : May মাসের মজার ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্টে ফ্যারাড MFD এবং Mfd লেখা হয়েছে ভুল করে ওটা হবে μF।

বিশেষ রচনা

আমাদের ছায়াপথে আমরা কোথায়

অরূপরতন ভট্টাচার্য

মহাকাশ মানেই যেন এক বিচিত্র রহস্য। মেঘ নেই এমন রাতে আমরা সবাই তারকায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হই। ছোট বড়, উজ্জ্বল অনুজ্জ্বল কত তারা! সব তারার রংয়ের বাহারও এক রকমের নয়। কোনোটি বর্ণে লালচে, কোনোটিতে আবার হলুদের আভাস। এই তারারা কোথাও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, কোথাও আছে আবার খুব ঘন হয়ে।

তোমরা ছায়াপথের নাম শুনেছো?

একজন শুভ্রকায় বিশাল বপু স্ফীতোদর ব্রাহ্মণের কথা কল্পনা কর। সেই ব্রাহ্মণকে বেষ্টন করে রয়েছে হাতে পেঁজা সুতোর সাদা একগুচ্ছ পৈতে। মহাকাশকে বেষ্টন করে ঠিক ওইরকমভাবে চলে গিয়েছে ছায়াপথ। ব্রাহ্মণের পৈতের একটা অংশ দেখা যায় ভুঁড়ির উপরে, আর একটা অংশ পিঠে। আমাদের ছায়াপথও সেরকম। মহাকাশের একদিকে সে আছে বৃষ রাশি আর মিথুন রাশির অনেকটা মাঝামাঝি, অন্য দিকে তাকে দেখা যায় বৃশ্চিক রাশি আর ধনু রাশির ভেতর দিয়ে। যখন সে মাথার উপরে তখন অনেক তারায় মিলে সে দুধের মত শুভ্র, একটা চওড়া বেষ্টনীতে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করছে। এমনিতে মেঘ না থাকলেও ধুলো ভরা শহরের আকাশে ছায়াপথকে সব সময়ে চিনতে পারা যায় না, কিন্তু যখন শহরের আলো নিভে যায়, সে সময়ে মাথার উপরে থাকলে ছায়াপথকে নিশ্চয়ই আমরা দেখতে পাব। এই ছায়াপথে আছে অজস্র তারা। দূরবীন দিয়ে লক্ষ্য কর, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তারা তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এতে কত তারা আছে জানো? বিজ্ঞানীরা বলছেন, ছায়াপথে আছে 100,000 000,000 তারা। অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার কোটি তারকা। এক কোটির কথা চিন্তা করতেই আমাদের কল্পনায় টান পড়ে। আর সেখানে দশ হাজার কোটি। এরা যে সবাই সব জায়গাটায় ঘন হয়ে আছে, এ কথাটা বলা যায় না। বড় রাস্তায় বেশি ভীড়, কিন্তু গলির মোড়ে নয় কিম্বা কুল গাছের একদিকটা কুলে ছেয়ে গেছে আর একদিকটা একেবারে ফাঁকা, এ যেন অনেকটা সেরকম।

এই যে তারায় তারায় মিলে পথের চেহারা, বাংলায় একে আমরা ছায়াপথ বললে কি হবে, এর আসল নাম Milky way। দুটো কাচের বড় ডিসকে মুখোমুখি বসিয়ে দিলে যেমন হয়, এর চেহারাটা আসলে সেইরকম। কিম্বা প্যানে দুটো পোচ বানালে একের পর এক ডিমের কুসুম দুটো না ফাটিয়ে। তারপর তাদের মুখোমুখি না রেখে বা একটার উপরে আরেকটাকে না বসিয়ে পিঠোপিঠি এনে যদি রাখি, আর কুসুম যদি না ভাঙ্গে তাহলে সেই চেহারাটার সঙ্গে আমাদের ছায়াপথের তুলনা করা যায়। এই

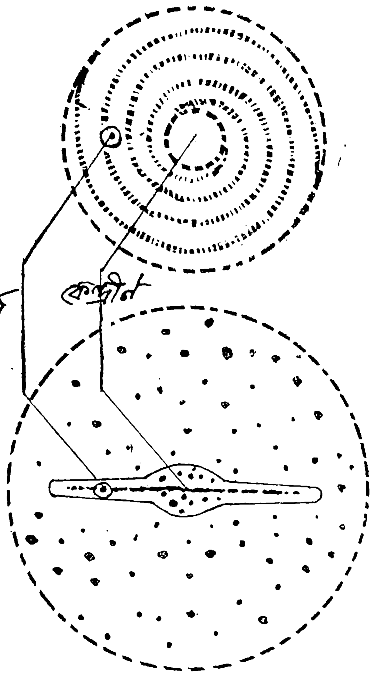

ছায়াপথের চেহারা

যে মাঝের দিকটা স্ফীত আর ধারের দিকটা পাতলা হয়ে এসেছে, এটা কি আছে সহজভাবে বা স্বাভাবিক ভাবে? না, সমস্তটাই আছে চক্রাকারে। এর ভেতরে রয়েছে কেন্দ্রীণ (Nucleus)। যে প্যানে ডিমের পোচ হচ্ছে, সেই প্যানের ব্যাস বা ডিমের পোচের ব্যাস 6 ইঞ্চি বা 15 সেণ্টিমিটার হতে পারে। কিন্তু এই ব্যাসকে টেনে কত বাড়ালে তবে আমাদের ছায়াপথের ব্যাস পাবো? আমাদের ছায়াপথের ব্যাস প্রায় 30 কিলো পার্সেক (parsec)। আর এই বিপুল আয়তন ছায়াপথ, সমস্তটাই আছে অনেকটা মণ্ডলাকার তারকার একটা আবেষ্টনীর ভেতরে। ইংরেজিতে আমরা একে বলি spherical halo। সেখানে তারকার-সন্নিবেশ ঘন নয়। কিন্তু যদি ব্যাসের হিসেবের মধ্যে এটুকুকেও ধরতে হয়, তাহলে সবটার ব্যাস হয়ে যায় অনেক বড় এবং অনেক বেশি পার্সেক।

পার্সেক কথাটা শুনে তোমরা হয়তো অবাক হয়ে যাচ্ছ। এটা যে দূরত্বের একটা একক তা তো বুঝতেই পারছ। কিন্তু দূরত্বের এরকম এককের কথা তো আগে শোনোনি। ইঞ্চি, ফুট, গজ, মাইল এক কালে চালু ছিল, তারপর এল মিটার, কিলোমিটারের যুগ। কিন্তু পার্সেক? দূরত্ব যেখানে জ্যোতির্লোকের, আমাদের সৌরলোকের সীমানা ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে ছড়িয়ে গেছে যেখানে মাইলে, কিলোমিটারে হিসেবের কূল পাওয়া যায় না, সেখানে এই পার্সেকের ব্যবহার।

আমাদের পরিচিত এককে 1 পার্সেক কতটা দূরত্ব? কিলোমিটারে বললে তা হবে প্রায় 30 লক্ষ কোটি কিলোমিটার। বিজ্ঞানীরা একে অবশ্য আলোকবর্ষ ধরেও ব্যাখ্যা করেন। আলোকবর্ষ বলতে কি বোঝায়, তা কিন্তু আলোকবর্ষ কথাটা থেকেই বুঝে নেওয়া যায়। আলো এক বছরে যতটা পথ যায়, আলোকবর্ষ ততটা দূরত্ব বোঝায়। ব্যাপারটার মধ্যে যে কি বিরাটত্ব লুকিয়ে আছে

ধনু রাশি

ভেবে অবাক না হয়ে উপায় নেই। আলো 1 সেকেণ্ডে চলে 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল বা কিলোমিটারে 2 লক্ষ 99 হাজার 792 কিলোমিটার। তাহলে 1 বছরে সে কতটা দূরত্ব পার হয় ভাবতে পারো? আর এই যে দূরত্ব, তাকে 3·2616 দিয়ে গুণ করলে তবে পাওয়া যাবে 1 পার্সেকের হিসেব। আমাদের ছায়াপথের ব্যাস যেখানে 30 কিলো-পার্সেকের অর্থাৎ 30 হাজার পার্সেকের সমান, সেখানে কেন্দ্র অঞ্চলে এর গভীরতা কত? কেন্দ্র অঞ্চলে এর গভীরতা সবচেয়ে বেশি আর তা হল 4 কিলোপার্সেকের অর্থাৎ 4000 পার্সেকের মতন।

সম্পূর্ণ ছায়াপথটির কেন্দ্র আছে ধনুরাশির দিকে। আর ধনুরাশি ও বৃশ্চিকরাশির মধ্যে ছায়াপথের যে অংশ উজ্জ্বল তারার সংখ্যা সেখানেই সবচেয়ে বেশি। এইসব রাশির কাছে তারারা এমন ঘন হয়ে আছে যে, তাদের

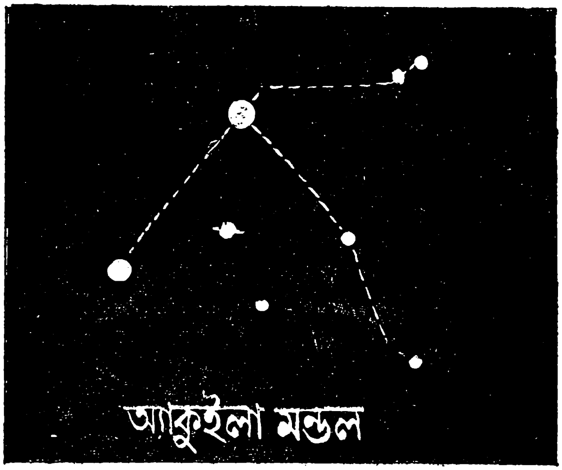

অ্যাকুইলা মন্ডল

চেহারা ফাঁক না পড়া এক উজ্জ্বল মেঘের মত। বৃশ্চিক আর ধনুরাশি আছে দক্ষিণের আকাশে। শ্রাবণ, ভাদ্র মাসের সন্ধ্যায় সরাসরি দক্ষিণের আকাশের দিকে তাকালে এদের লক্ষ্য করা যায়। এখানে দেখা ছায়াপথ দক্ষিণের আকাশের ছায়াপথ। উত্তর আকাশে ছায়াপথকে আমরা সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখবো সিগন্যাস আর অ্যাকুইলা মণ্ডলে। ছায়াপথে ধনুরাশিকে যেখানে দেখা যাচ্ছে, তার উত্তরদিকে ছায়াপথ ধরে এগোতে এগোতে আমরা দেখবো অ্যাকুইলা মণ্ডলকে, তারও উত্তর সিগন্যাস। শ্রাবণ, ভাদ্রে রাত গভীর হলে দুটো মণ্ডলকেই নজরে আসবে, কিম্বা আশ্বিন, কার্তিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে। এই ছায়াপথ সব জায়গায় সমান চওড়া নয়। বরং বলা যায়, কোথাও এ খুব সরুও আছে। তাছাড়া ছায়াপথ কোথাও আবার দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। আসলে এই যে ভাগাভাগি এর কারণ সরাসরি দৃষ্টির সম্মুখে অসীম শূন্যে ধূলিপুঞ্জ বা মেঘ-

পুঞ্জের অবস্থান যা ছায়াপথের অংশবিশেষকে আমাদের চোখের আড়ালে রেখে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করে যে, ছায়াপথ যেন ওইখানে দু ভাগ হয়ে গেছে।

এই বিচিত্র ছায়াপথ, আগে বলেছি, এর সমস্তটাই আছে চক্রাকারে। কিন্তু শুধু চক্রাকার বলে ছেড়ে দিলে তোমরা ব্যাপারটাকে পুরো বুঝতে পারবে কি? একটা প্যাঁচ দেওয়া স্প্রিং যে রকম, ছায়াপথ আছে সেইভাবে। কেন্দ্র থেকে তা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে গেছে। এর দুটি বাহু। কেন্দ্রীণের দু দিকে আছে দুটি। একটা আছে আমাদের দিকে, কেন্দ্র থেকে এটির দূরত্ব 3 কিলোপার্সেক হবে। এটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে সেকেন্ডে 50 কিলোমিটার বেগে। দ্বিতীয়টি আছে কেন্দ্রীণের অপর প্রান্তে। সেটি সেকেন্ডে 50 কিলোমিটার বেগে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ছায়াপথের অনেক উজ্জ্বল তারা আছে এই প্যাঁচের উপরে।

সূর্য একটি তারা। সে আছে এই ছায়াপথের উপরে। কিন্তু ছায়াপথে তাকে ঠিক কোথায় দেখা যাবে? ছায়াপথের সাধারণ তল হিসেবে যে তলটিকে ধরা যেতে পারে, সূর্য আছে সেই তল থেকে মাত্র কয়েক পার্সেক উত্তরে। এবং একেবারে এক প্রান্তের দিকে। চক্রাকার স্প্রিংয়ের চেহারা কল্পনা করলে সূর্যের অবস্থান একটা বাহুতে, বাহুর ভেতরদিকের ধারাটিতে।

দেখে সব সময়ে মনে না হলেও, এই ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই স্থির নয়, সবই আবর্তনরত, ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। সমস্ত ছায়াপথটাও আপন তলের উপরে কেন্দ্র বরাবর কল্পিত অক্ষকে পাক খাচ্ছে। সূর্য যে দূরত্বে আছে, সেখানে পাক খাওয়ার গতি সেকেন্ডে 250 কিলোমিটার। আর সূর্যের সমস্ত ছায়াপথকে ঘুরে আসতে সময় লাগে 22 কোটি বছর। অর্থাৎ এই 22 কোটি বছর হল সূর্যের এক বছর। কিন্তু সূর্যের 1 দিন কত? আপন অক্ষরেখার উপরে সূর্য একটা আবর্তন করে চলেছে। সূর্যের অক্ষাংশ অনুযায়ী 25 থেকে 27 দিনের মধ্যে এর হেরফের হয়।

আমাদের এই সূর্য সমস্ত জগৎ-সংসার, আমার এই হাতে ধরা বই, চলমান পৃথিবী ও সমস্ত সৌরজগৎকে নিয়ে তার নিকটের তারকাদের পটভূমিতে হারকিউলিস (hercules) মণ্ডলের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে। এই বিন্দুটিকে বলে solar apex। এর এগিয়ে চলার গতি সেকেন্ডে 19·4 কিলোমিটার। হারকিউলিস মণ্ডলটিকে কখন দেখতে পাব? শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে সন্ধেবেলায় এই মণ্ডলটিকে প্রায় মাথার উপরের আকাশে দেখতে পাব। এর কিছুটা দক্ষিণে বৃশ্চিক রাশি।

ছায়াপথ থেকে আমাদের পৃথিবীর দূরত্ব কতটা? কেউ বলেন, 8 কিলোপার্সেক, কেউ বলেন 11। তবে ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর দূরত্ব, অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে 10 কিলোপার্সেককে ধরাই সব দিক থেকে সমীচীন হবে।

ভাবতে পারো, এই ছায়াপথে কতটা পদার্থ আছে, যে পদার্থটিকে আমরা বলে থাকি ভর। সূর্যে যে ভর আছে, সে ভরের একটা হিসেব রয়েছে বটে, কিন্তু সে সম্পর্কে ধারণা করাও সহজ কথা নয়। সূর্যের ভর হিসেব করতে গেলে 1-এর পিছনে 28টা শূন্য লাগাও। কত বড় সংখ্যা হল ধারণায় আসে? 1 কোটির কোটি গুণ কর। তাকে আবার 1 কোটির কোটি গুণ দিয়ে গুণ কর। এই যে সংখ্যাটা, তার পিছনে কিলোগ্রাম বসিয়ে আমরা যে সূর্যের ভর পেয়ে যাচ্ছি সরাসরি, তা নয়। সূর্যের ভরের জন্যে আরও বড় সংখ্যার দরকার। একে 199 দিয়ে গুণ করলে তবে কিলোগ্রামে আমরা পাই সূর্যের ভর।

এবার সূর্যের ভর সম্পর্কে একটা ধারণা মাথায় রেখে ছায়াপথের ভর একে ছাড়িয়ে কতটা যেতে পারে হিসেব কষা যাক। সূর্যের যা ভর, ছায়াপথের ভর তার চেয়ে 20000 কোটি গুণ বেশি। মহাকাশে দৈত্যাকার সব সংখ্যার হিসেব লক্ষ্য করবার মত। ছায়াপথের সমস্ত ভরটা অবশ্য তারার মধ্যে নেই। দুটি তারার মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলিতেও আছে সমস্ত ভরের 10 ভাগের মত ভর।

এই সূর্যকে ঘিরেই আমাদের সৌরজগৎ। বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছে, তারপরে আছে শুক্র, এরপরে আমাদের পৃথিবী, এবারে আসছে ক্রমে ক্রমে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো। কিন্তু সমগ্র ছায়াপথে যেখানে দৈত্যের মত সংখ্যা নিয়ে আমাদের কারবার সেখানে সূর্য থেকে এদের অবস্থান আলাদা করে দেখা সহজ নয়।

103/E কাঁকুলিয়া রোড, কলকাতা-29

গাইগার মূলার কাউন্টার

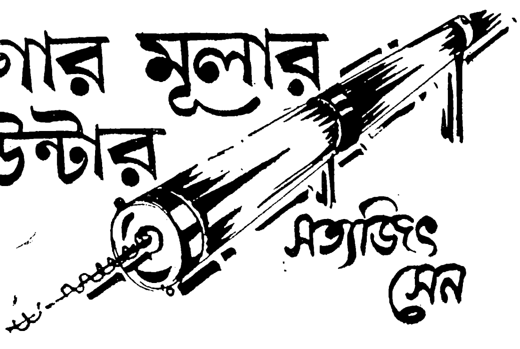

সত্যজিৎ সেন

তেজস্ক্রিয়তা (Radio activity) মাপবার জন্য প্রায়শই গাইগার-মূলার কাউণ্টার (Geiger Muller Counter) যন্ত্রের কথা শোনা যায়। এখানে এই যন্ত্রটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

এই যন্ত্রে একটি ধাতব চোঙের মধ্যে নিষ্ক্রিয় আর্গন গ্যাস পুরে নেওয়া হয়। চোঙটির এক মুখ খোলা এবং এখানে একটি অভ্রনির্মিত পাতলা পাত বা 'মাইকা উইণ্ডো' থাকে। চোঙটির বন্ধ প্রান্ত দিয়ে একটি সরু ধাতব তার প্রবেশ করানো হয়। ধাতব তারটি ধনাত্মক তড়িৎদ্বার বা 'অ্যানোড' এবং চোঙটির অন্তর্গাত্র ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার বা 'ক্যাথোড' রূপে ব্যবহৃত হয়। দুই তড়িৎদ্বারের বাইরের দিক অন্তরিত (Insulated) রাখা হয়। দুই তড়িৎদ্বারের ভিতর প্রায় 1000 ভোল্ট বিভব প্রভেদ সৃষ্টি করা হয়।

কোন তেজস্ক্রিয় রশ্মি (তা সে আলফা, বিটা বা গামা যাই হোক না কেন) অভ্রের পাতের উপর এসে পড়লে তা ঐ অভ্রপাতকে ভেদ করে আর্গন অণুগুলিকে আয়োনিত করে। গ্যাস অণুগুলি থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়ে ধাতব তার অর্থাৎ অ্যানোডের দিকে আকর্ষিত হয় এবং আয়নিত ধনাত্মক পরমাণু ক্যাথোড তথা ধাতব চোঙের অন্তর্গাত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে গ্যাসের মধ্য দিয়ে ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক তড়িৎদ্বারের দিকে একটি তড়িৎ মোক্ষণ বা 'ডিসচার্জ' চলতে থাকে। এই তড়িৎ-প্রবাহকে বিবর্ধক বা 'অ্যামপ্লিফায়ার'-এর সাহায্যে বিবর্ধিত করে একটি বিশেষভাবে নির্মিত 'মিটার' বা গণকের মধ্যে পাঠানো হয়। 'মিটার' দ্বারা নির্দেশিত তড়িৎমোক্ষণের হার তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা সূচিত করে।

বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।

'কুসুমিতা' কলেজপাড়া, সিউড়ি, বীরভূম-731101

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

গত 31শে মে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার 5ম বর্ষ-পূর্তি অনুষ্ঠানে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীসিদ্ধার্থ ঘোষ পরিষদের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। গৃহীত কর্মসূচীর সঙ্গে আরও কিছু পরিকল্পনা যুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় জেলায় কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের শাখা অফিসগুলি নিজস্ব ভাবনা চিন্তা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী করবে। কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের মূলকেন্দ্র শাখা অফিসগুলিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। অথবা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত যে কোন বিজ্ঞানানুরাগী সংস্থার সহযোগিতায় কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ জেলায় জেলায় অনুষ্ঠান করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সবক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য বিজ্ঞান মানসিকতার প্রচার ও প্রসার। ইতিমধ্যেই মেদিনীপুর জেলায় কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ছাত্র-ছাত্রীগণকে এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় দপ্তরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঘনাদা ক্লাবের সদস্যদের সুপারিশ অনুযায়ী কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতঃ এই সংখ্যা থেকেই ঘনাদা চর্চার একটা হদিশ পাওয়া সম্ভব। এবং অন্যান্য পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। তাই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে আমরা তাদের মতামত জানতে চাই।

অমরনাথ রায়	সুধাংশু পাত্র
NB/T 99A, New Traffic	গ্রাঃ+পোঃ—কালিন্দী
পোঃ—ইন্দা (খড়্গপুর)	জেলা—মেদিনীপুর
জেলা—মেদিনীপুর	

অন্যান্য জেলায় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকা ও বিজ্ঞানানুরাগীদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন এ ব্যাপারে পরিষদের কেন্দ্রীয় অফিসে যোগাযোগ করেন।

কেন্দ্রীয় অফিস ঃ কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ
86/1, মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-9

খুদে বৈজ্ঞানিক
দিলীপ দাস
এ-এ্যাই! কে রে?
ছাড় ছাড় বলছি, লাগছে!
খুদে–তুই! ওঃ, অনেক দিন পরে এখানে এলি।
স্কুলে হঠাৎ এক সপ্তাহের ছুটি পাওয়া গেল তাই মামার বাড়ি চলে এলুম।
তুই তো একবার কলকাতায় গেলি না।
এবার যাব। এ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেলে।
হ্যাঁরে, গলায় হাতে এসব কি ঝুলিয়েছিস রে ফটকে?
তাবিজ কবচ।
আগে তো দেখিনি! হঠাৎ এত সব ঝোলাবার কারণ?
যদি কিছু হয়, তাই।
এ আবার কি কথা!
মানে ভূত প্রেত — আমাদের গাঁয়ে কদিন যাবৎ এঁদের খুব উৎপাত শুরু হয়েছে কিনা তাই।
তার জন্য এত! তুই তো একেবারে কবচের দোকান খুলে বসেছিস।

দোকান নয়। এটা হল শাঁকচুন্নীর কবচ, এটা হল পেত্নীর, এটা হল ব্রহ্মদত্যির, এটা হল মামদো আর এইটা হল—
!
তুই একটা ননসেন্স, ইডিয়েট, রাস্কেল, একটা—
পরিশেষে বলি, একটা ছাগল। এই বিংশ শতাব্দীতে ভূত বলে কিছু আছে? যা ছিল সেও বিফোর সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার।
কিন্তু গাঁয়ের সবাই দেখেছে.. আমিও দেখেছি।
যত্তোসব অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড! ওঁদের সঙ্গে আমার একটু মোলাকাত করিয়ে দিতে পারিস?
কেন পারবো না। সন্ধ্যের দিকে ঐ জলার ধারে গেলেই দেখতে পাবি, ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কিন্তু—
বুঝেছি। তোকে যেতে হবে না, শুধু জায়গাটা দেখিয়ে দিবি ব্যাস।
তোর দিদু এসব জানতে পারলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।
তুই কি ভেবেছিস আমরা দিদুকে জানিয়ে যাব?
খুদে-ভূত নিয়ে ইয়ারকি মোটেই ভাল নয়। তুই ফিরে চল, আমি তোকে পাঁচটা ডাঁসা পেয়ারা খাওয়াবো।
পেয়ারা আমার খুব ফেভারিট। ভূত দেখে এসে ওগুলো খাবো কেমন?

ও-ও-ওই, ভূত আসছে!
ক্-কোথায়?
ঐ তো, দেখছিস না? একটা আগুন কেমন জলার এদিক ওদিক ছুটে বেড়চ্ছে আর মাঝে মাঝে জ্বলছে নিভছে!
পালিয়ে চল খুদে!
হাঃ-হাঃ-হাঃ,
হিঃ-হিঃ-হিঃ, ঐ তোদের ভূত! হোঃ-হোঃ-হোঃ!
বলা নেই কওয়া নেই ও অমন হাসছে কেন? নির্ঘাৎ ওকে-
তখন অত করে বারণ করলুম! এখন কি হবে?
এঁবার সঁব ভূঁতেরা জঁয়েন্টলি তোঁর গঁলা টিঁপবো।
ওরে বাবারে আমাকে ভূতে ধরলো। বাঁচাও-ও-ও!
আরে ফটকে অমন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটচ্ছিস কেন?
জ-জলার ভূত!
কোথায়?
খুদে জলায় গেছল ভূত দেখতে। এখন ওকেই ভূতে ধরেছে!
এঁসে গেঁছি। কোঁথায় ফঁটকে? জঁলার ভূঁত আঁমি।

এই বাঁদর হতভাগা তোকে তো আমি পই পই জলায় যেতে বনিষেধ করেছিলুম।
খঁবরদার আঁমাকে বাঁদর বঁলবে নাঁ, আঁমি এঁখন কিঁম্ভুত।
ওগো মাগো, আমার খুদের এ কি হলো! ওরে বাবারে!
সেরেছে!
দিদু-দিদু, খামোখা কেন অমন চেল্লাচ্ছ? ভূত কোথায়-যে আমাকে ধরবে? আমি ইয়ারকি করছিলুম।
অ্যাঁ!
তোমরা যাকে ভূত বলছো আসলে ওটা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া।
তোর মাথা আর আমার মণ্ডু!
একটু চেষ্টা করলেই তুমিও বুঝতে পারবে দিদু। সাধারণত এরকম জলো অঞ্চলেই উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থ পচে গিয়ে মিথেন নামে এক প্রকার গ্যাস উৎপন্ন হয়। তেমনি বিভিন্ন জীব জন্তুর দেহাবশেষ পচনের ফলে উৎপন্ন হয় ফসফরাস ডাই হাইড্রাইড ও ফসফিন। এই গ্যাস খুব দাহ্য। এখন বায়ুর সংস্পর্শে এসে এই গ্যাসের সঙ্গে মিথেনও জ্বলে উঠে—
এবং এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। অন্ধকারে এই আগুন দূর থেকে দেখা যায়, কখনো জ্বলছে কখনোও নিভছে।
তাহলে ওগুলো গ্যাসের আগুন?
এর মধ্যে কোন ভৌতিক ব্যাপারই নেই। পুরোপুরি সায়ান্টিফিক। এর নাম আলেয়া।
আলেয়া!
তাহলে দিদু, আমরা কি জলাতে মাছ ধরতে যেতে পারি?
নাঃ-হ্যাঁ। আমার ভয় নতুন জায়গায় এসে যদি ঠান্ডা লেগে যায় তাই।
পরদিন- এতদিন মিথ্যে ভূতের ভয়ের জন্য দিদু লজ্জিত, তাই এখন ঠান্ডার ওজর দেখাচ্ছে। হিঃ-হিঃ-হিঃ।
আমিও ঐ তাবিজ কবচগুলো সব পাতকুয়োয় ফেলে দিয়েছি!

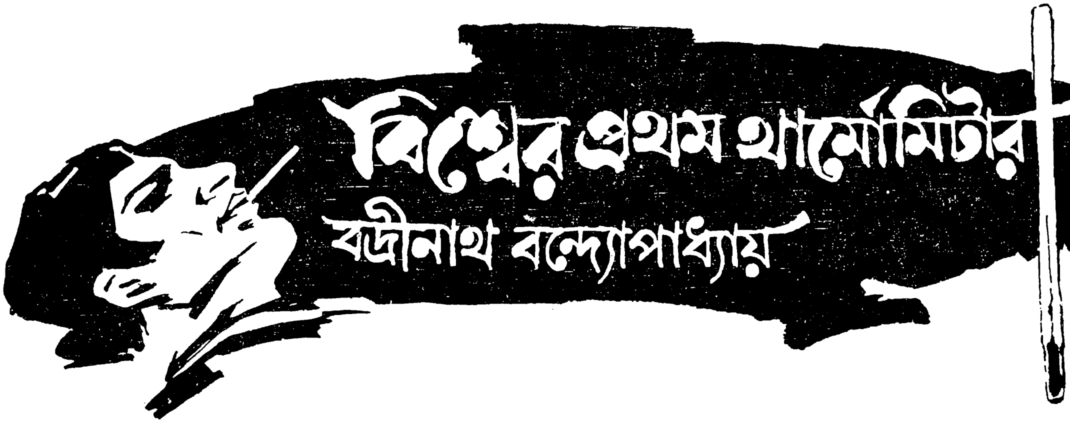

বিশ্বের প্রথম থার্মোমিটার

বদ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

1612 খ্রিস্টাব্দ। ইতালীর এক ভদ্রলোক—নাম স্যানটোরিও সানতোর ওরফে স্যাংটোরিয়াস্ লিখলেন একখানা বই। তাতে লিখলেন 'আমার কাছে একটা যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্র দিয়ে শুধুমাত্র বাতাসের ঠাণ্ডা গরমভাব মাপ করা যায় না—যায় শরীরের নানান অংশের উত্তাপও। পাদুয়ায় আমার ছাত্রদের সে যন্ত্র ও তার কাজের পদ্ধতি দেখিয়েছি। তারা আশ্চর্য হয়ে গেছে।

যাঁরা সে খবর আগে শোনেননি তাঁরা সত্যিই অবাক হয়ে গেছেন। স্যাংটোরিয়াস সে জিনিস করলেন কি ক'রে? 1612 খ্রিস্টাব্দের আগেরই খবর। স্যাংটোরিয়াস অসুস্থ মানুষের তাপ কি করে নেওয়া যায় সে চিন্তায়ই মগ্ন। তিনি উদ্ভাবন করলেন থার্মোমিটার। তাঁর থার্মোমিটার কিন্তু তৈরি হল নানান চেহারার। কিন্তু সব কটি ক্ষেত্রেই থার্মোমিটারের মাথায় রইল একটা বাল্ব আর নলটি তলার দিকে ডুবোনো থাকল কোন একটি তরল পদার্থের পাত্রে। স্যাংটোরিয়াস বাল্বটিকে একবার নিজের মুখে পুরলেন—দেখলেন তরলপদার্থটি সে নলে কতখানি ওঠে। তারপর সেই বাল্বটিকে রোগীর মুখে পুরে দিলেন। দেখলেন তরল পদার্থটি নলের ভেতর কতখানি ওঠে। তফাৎটুকু থেকে বলতে পারলেন রোগীর স্বাভাবিকের থেকে তাপ বেশি কি কম।

স্যাংটোরিয়াসের আরো অন্য ধরনের থার্মোমিটার ছিল। তা দিয়ে তিনি কখনও রোগীর হাতের তাপ কিংবা শ্বাসপ্রশ্বাসের গরমভাব মাপ করতেন। সে আমলে অন্য অনেকের মত তাঁরও বিশ্বাস ছিল শ্বাসপ্রশ্বাস হৃদযন্ত্র থেকে ওঠে। সে যাক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাপ মাপ করা। সুতরাং নলের ওপর নিজের ইচ্ছা মতন মাপের দাগ—যাকে বলে স্কেল—ঘর কেটে কেটে বসাতে থাকলেন। কোনটাতে আবার দু টুকরো দড়ি নলের গায়ে বেঁধে রাখলেন। মাপ করার স্বার্থেই সে সব ঠিকই। ইতালীর ভেনিস বা পাদুয়ায় বসে বসেই তিনি তাঁর উদ্ভাবনের কাজটুকু সেরে ফেললেন। থার্মোমিটারের নাম অবশ্য তিনি দিয়েছিলেন 'থার্মোস্কোপ'।

স্যাংটোরিয়াস যে স্বয়ং থার্মোমিটার উদ্ভাবক একথা কিন্তু তিনি নিজে দাবি করেননি। এর ফলে সত্যি সত্যিই কে প্রথম থার্মোমিটারের উদ্ভাবক তা মানুষের কাছে গোলমেলে হয়ে গেছে। যেমন ধরা যাক্ রবার্ট ফ্লাডের কথা। ফ্লাড ছিলেন ইংলণ্ডের অক্সফোর্ডের একজন চিকিৎসক। তিনি থার্মোমিটার উদ্ভাবনের সম্ভাব্য মানুষ অনেকে বলেন। অনেকে বলেন ডাচ্ যান্ত্রিক করনেলিয়াস ড্রেবেল, অনেকে বলেন বিখ্যাত ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও হলেন থার্মোমিটার তৈরির আসল মানুষ। হতে পারে, হয়ত বা সবাই থার্মোমিটার করেছিলেন, কেউ কারুর খবর না রেখে। কিন্তু একথা ঠিক সবাই সমসাময়িক হলেও একজন নিশ্চয়ই আগে পরে করেছিলেন। সেক্ষেত্রে স্যাংটোরিয়াসের নাম আগেই চলে আসে। এমনকি থার্মোমিটারের পদ্ধতি অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ার হিরো যে কৃত্রিম ঝর্ণা তৈরি করেছিলেন তাও যেহেতু তাপ নির্ণয়ের জন্য নয়, সেহেতু তিনি স্যাংটোরিয়াসের প্রতিদ্বন্দ্বীর হিসেবের তালিকায় আসেন না। সুতরাং মোটামুটিভাবে বলতে গেলে স্যাংটোরিয়াসই বিশ্বের প্রথম থার্মোমিটারের নির্মাতা।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পি. ডব্লিউ. ডি. কনস্ট্রাকশন ডিভিশন নং V, 2, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-1

সৌরজগতের বয়স মৃন্ময়ী দাস

সৌর জগতের বয়স কত? গাছের বয়স মাপা হয় তার কাণ্ডে কতগুলি বৃত্তাকার দাগ আছে গণনা করে, ঘোড়ার বয়স জানা যায় তার দাঁত দেখে। সেইরকম নটি গ্রহ, গ্রহাণু, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি নানান বস্তু নিয়ে গড়া আমাদের এই সৌর জগতের বয়স জানারও কি কোনও বিশেষ পদ্ধতি আছে? এ প্রশ্ন বিজ্ঞানীদের অনেকদিনের। এর জন্য তাঁরা খুঁজেছেন সৌরজগৎ বা পৃথিবীর বুকে এমন কোনও বস্তু দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে যার মধ্যে বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। জানতে চেষ্টা করেছেন, সৃষ্টির আদিতে ওই বস্তুটি কি অবস্থায় ছিল, বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এবং পরিবর্তনের হারই বা কি রকম।

একসময় সাগর জলে লবনের পরিমাণ মেপে বয়স জানার চেষ্টা চলেছিল। সৃষ্টির প্রথমে সমুদ্রের জল লবনাক্ত ছিল না। বৃষ্টির জলও লবনাক্ত নয়। বৃষ্টির জল পাহাড় সমতল প্রভৃতির লবন ধুয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে। সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, লবন পড়ে থাকে। এই বাষ্প আবার বৃষ্টি হয়ে স্থলভাগের লবন ধুয়ে এনে সমুদ্রে জমা করে। চক্রাকারে চলে এই প্রক্রিয়া। সমুদ্রে জমা লবনের পরিমাণ এইভাবে বেড়ে চলে। গড়ে প্রতিবছর কতটা লবন সমুদ্রে জমছে এবং মোট জমা লবনের পরিমাণ জেনে কত বছরে এই লবন জমেছে তা গণনা করা হয়। এটাই সমুদ্র বা পৃথিবীর বয়স। এইভাবে মেপে পৃথিবীর বয়স দাঁড়ায় 30 কোটি বছর। ভূতাত্ত্বিকদের মতে এই গণনায় ভুল থাকা সম্ভব। কেননা বর্তমানে পৃথিবীতে এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ী অঞ্চল আগের থেকে বেড়েছে। তাই বৃষ্টির জল এখন প্রতিবছরে আগের তুলনায় অনেক বেশি লবন স্থলভাগ থেকে ধুয়ে এনে সমুদ্রে ফেলছে। তাছাড়া সমুদ্রের বয়স ও পৃথিবীর বয়স এক ধরে নেওয়ার অন্য অসুবিধাও আছে। সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর ভূত্বক গলন্ত অবস্থায় ছিল। সেই প্রচণ্ড উত্তাপে সমুদ্র বা বৃষ্টির অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকা সম্ভব নয়।—সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে আরও অনেক পরে।—

পরবর্তীকালে পৃথিবীর বয়স গুণা হয়েছে তেজস্ক্রিয় মৌলের ক্ষরণ মেপে। তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণু আলফা কণা, বিটা কণা ও গামারশ্মির ক্ষরণ ও বিকিরণের ফলে অন্য পরমাণুতে পরিণত হয়।—এই পরিবর্তনের হার নির্দিষ্ট। তাপ ও চাপের ওপরও নির্ভর করে না।—পৃথিবীর কিছু কিছু পাথরের মধ্যে এইরকম তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ জমা হয়ে থাকে। যেমন ইউরেনিয়াম—238 অর্থাৎ যে ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক ভর 238, থোরিয়াম—232 প্রভৃতি। ইউরেনিয়াম—238 পরিবর্তিত হয় থোরিয়াম—234-এ। থোরিয়ামে ঘটে আবার পরিবর্তন। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণ না 206 ভরবিশিষ্ট লেড—206 তৈরি হয়। একইভাবে তেজস্ক্রিয় থোরিয়াম—232 মৌল ভাঙতে ভাঙতে হয় লেড—208। এই লেড—206 বা লেড—208 তেজস্ক্রিয় নয়। এদের মধ্যে তাই আর পরিবর্তন হয় না, সমুদ্রের লবনের মতই এরা পাথরের বুকে জমা হয়ে থাকে।—

কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্ষরণের ফলে পূর্ব পরিমাণের অর্ধেকে পরিণত হতে যে সময় নেয় তাকে বলা হয় তার অর্ধজীবন। ইউরেনিয়াম—238 থেকে লেড—206এ পরিণত হওয়ার অর্ধজীবন 450 কোটি বছর অর্থাৎ যতটা ইউরেনিয়াম—238 প্রথমে থাকুক না কেন, 450 কোটি বছরে তার অর্ধেক ভাগ লেড—206এ পরিণত হবে। এর থেকে বছরে কতটা ইউরেনিয়াম লেডে পরিণত হচ্ছে তার হার মাপা যায়। সৃষ্টির প্রথমে পাথরটির মধ্যে কোনও লেড ছিল না ধরে নিলে বর্তমানে পাথরের মধ্যেকার সমস্ত লেডই এসেছে ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয় ক্ষরণের ফলে। এইভাবে বর্তমানে পাথরের মধ্যে ইউরেনিয়াম ও লেড কতটা আছে এবং ইউরেনিয়ামের লেডে পরিণত হওয়ার হার জেনে, কত বছরে এই লেড জমা হয়েছে তা জানা যায়। এই সময়টাই পাথরটির অর্থাৎ পৃথিবীর বয়স। এইভাবে মাপলে পৃথিবীর বয়স দাঁড়ায় 340 কোটি বছর। এখানেও কিছু অসুবিধা আছে। সৃষ্টির প্রথমে পাথরটির মধ্যে কিছু লেড থাকতে পারে, যেটার পরিমাণ জানা যায় নি, আর পৃথিবীর প্রাচীনতম পাথর কোনটি জানাও সম্ভব নয়। এই পদ্ধতির কিছু কিছু সংশোধনের পর পৃথিবীর বয়স দাঁড়িয়েছে এখন 460 কোটি বছরে।

একই পদ্ধতিতে সৌরজগতের বয়সও মাপা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু উল্কার টুকরো বেছে নিয়েছেন যাদের মধ্যে কোনও তেজস্ক্রিয় মৌল নেই, কিন্তু লেড আছে। এই পরিমাণ লেড সৃষ্টির প্রথম থেকেই উল্কার মধ্যে আছে বলে ধরা হয়। এরপর তেজস্ক্রিয় মৌল আছে এমন উল্কার টুকরো নিয়ে আগের পদ্ধতিতে অর্ধজীবন মেপে উল্কার বয়স মাপা হয়। এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় ক্ষরণের ফলে জমা লেড থেকে, সৃষ্টির প্রথমে উল্কায় যে লেড ছিল তাকে বাদ দিয়ে ইউরেনিয়ামের লেডে পরিণত হওয়ার হার মাপা হয়। বিভিন্ন উল্কার টুকরো নিয়ে পরীক্ষা করে মোটামুটি একই ফল পাওয়া গেছে। এইভাবে উল্কার বয়স মাপা হয়েছে 460 কোটি বছর। উল্কা সৌরজগতের পরিবারভুক্ত সদস্য। তাই আমাদের এই সৌরজগতের বয়সও ধরা হয় 460 কোটি বছর।

হৃৎপিণ্ডের গঠন ও কাজ

ননীগোপাল দাস

হৃৎপিণ্ড একটি চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট মাংসপেশীর যন্ত্র যা স্বয়ংক্রিয় ভাবে সংকোচন ও প্রসারণ করে সমস্ত দেহে রক্ত সংবহন করে। মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষকোটরে দুটি ফুসফুসের মধ্যে এমনভাবে অবস্থিত যে এর তিন ভাগের দুভাগ শরীরের মধ্যরেখার বাঁয়ে এবং একভাগ ডানদিকে থাকে। কিছুটা শক্ত পর্দা দিয়ে Pericardium) হৃৎপিণ্ডকে এমনভাবে ঢেকে রাখা হয়েছে যাতে এর স্বাভাবিক অবস্থানের নাড়াচাড়া না হয় অথচ সংকোচন ও প্রসারণেও বাধা না হয়। এই অবস্থানের ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয় কারণ হৃৎপিণ্ডের সামান্য অনিয়মিত কম্পন একটি মানুষের হঠাৎ মৃত্যু ঘটাতে পারে।

মাত্র তিনশত গ্রাম ওজনের এই হৃৎপিণ্ড একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের সারা জীবনে প্রায় 260 কোটিবার ক্রমাগত সংকোচন ও প্রসারণ করে শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে এবং প্রতিটি নিলয় থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টন রক্ত পাম্প করে শরীরে সরবরাহ করে যার জন্য হৃৎপিণ্ডের পরিশ্রমের পরিমাণ প্রায় দশ টন ওজনকে দশ মাইল উঁচুতে তোলার সমান। তাই হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী এতই স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে এর কোন বিভাজন ক্ষমতা নেই। তাই অসুস্থ বা মৃত হৃদপেশী কখনও কোষ বিভাজনের দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। সোজা কথায় এটা মানুষের চরম দুর্ভাগ্য।

এখানে ছবিতে (চিত্র-1) দেখা যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের উপরের দুটি প্রকোষ্ঠ (ডান ও বাঁম অলিন্দ) নীচের দুটি প্রকোষ্ঠের (ডান ও বাম নিলয়) সঙ্গে ডান ও বাম কপাটিকাযুক্ত ছিদ্রের দ্বারা যুক্ত। সমস্ত শরীরের কার্বন অক্সাইড যুক্ত দূষিত রক্ত অগ্র মহাশিরা (superior vena cava), পশ্চাৎ মহাশিরা (Interior vena cava) ও করোনারী শিরা দিয়ে ডান অলিন্দে আসে এবং সেখান থেকে প্রবাহিত হয় ডান নিলয়ে। তারপর বিশোধনের জন্য রক্ত ফুসফুসীয় ধমনী (Pulmonary artery) দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ডান ও বাম ফুসফুসে যায়। ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বাম অলিন্দে ফুসফুসীয় শিরা (Pulmonary vain) দিয়ে ফিরে আসে ও বাম নিলয়ে প্রবাহিত হয়। বাম নিলয়ের সঙ্গে মহাধমনী (Aorta) সংযুক্ত থাকে এবং বিশুদ্ধ রক্ত এখান থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আবার সেখান থেকে ডান অলিন্দে দূষিত রক্ত গিয়ে ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ডের নিয়ত সংকোচন ও প্রসারণের ফলেই এইভাবে রক্ত সঞ্চালিত হয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ডান দিকের দূষিত রক্তের সঙ্গে বামদিকের বিশুদ্ধ রক্তের কখনও মিশ্রণ হয় না।

হৃৎপিণ্ড খাদ্য পায় দুটি বাম করোনারী ধমনী থেকে। যাদের উৎপত্তি হয় মহাধমনীর উৎস ভাগ থেকে। এদের ভেতর দিয়ে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত হৃদপেশীতে প্রবাহিত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত রক্ত পেশী থেকে করোনারী শিরা মারফৎ ডান অলিন্দে পৌঁছায় (চিত্র-2)।

এই করোনারী ধমনীর কোন বড় শাখার ছিদ্রপথ হঠাৎ যদি কোন জমাট রক্তখণ্ড বা অন্য কিছুতে বাধা পায় তাহলে হৃৎপিণ্ড ভয়ঙ্কর ভাবে সংকোচিত হয় এবং মানুষটি বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন এবং হঠাৎ মৃত্যুও হতে পারে, যেটা সাধারণভাবে করোনারী থ্রম্বোসিস নামে অভিহিত। কিন্তু যদি ঐ ধমনীর খুব ছোট শাখা প্রশাখায় ধমনীর সংকোচনে বা অন্য কোন কারণে রক্ত সঞ্চালনে সামান্য বাধা আসে, তাহলেও বুকে ব্যথা হবে—যা বিশ্রামে কমে এবং সামান্য পরিশ্রমে বাড়ে এবং এই ব্যথা আগের মত মারাত্মক নয়। একেই বলে এন্‌জাইনা পেক্টারিস।

মাতৃজঠরে একটি শিশুর শরীরের বিভিন্ন অংশের সুষ্ঠুভাবে গঠন ও বৃদ্ধি একটি অকল্পনীয় ব্যাপার। এর ব্যতিক্রমও হয় তাই আমরা নানা রকমের জন্মগত বিকৃতি দেখতে পাই। যেমন, অনেক সময় বুকের সামনের অস্থিটি (sternum) ঠিকমত গঠিত না হয়ে জায়গাটা শুধু চর্ম দিয়ে ঢাকা থাকে এবং এর ঠিক নীচেই হৃৎপিণ্ড থাকে তাই এর স্পন্দনও দেখা যায়। এরকম বিকৃতি হলে অনেক সময় খবরের কাগজেও খবর হয় যে একটি শিশু জন্ম নিয়েছে তার হৃৎপিণ্ড বুকের বাইরে নিয়ে! আমরা জানি হৃৎপিণ্ড বুকের বামদিকে থাকে এবং হাত দিয়ে তার স্পন্দন (apex beat) অনুভব করতে পারি। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কোন রোগ ছাড়াই হৃৎপিণ্ডটি বুকের ভেতর সম্পূর্ণ ডান দিকে থাকে। এতে ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। হয়ত বুকের ও পেটের ভেতরের সব কিছুই আয়নায় প্রতিবিম্বের মত উল্টে আছে (Situs Invernes to fulis), কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুই হৃৎপিণ্ড ডানে থাকতে পারে (Dextro cardia, অবশ্য রোগও এই উল্টো অবস্থার কারণ হতে পারে—যেমন ফুসফুসের পুরানো যক্ষ্মা রোগ হৃৎপিণ্ডকে এদিক সেদিক টেনে নিতে পারে।

জন্মগত সব রকম গঠন বিকৃতির মধ্যে এক চতুর্থাংশই হয় হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি। পরিসংখ্যান বলে এক হাজার শিশুর মধ্যে ছয়টির জন্মগত হৃৎপিণ্ড বিকৃতি দেখা যায় এবং এর ভেতর আবার 20 শতাংশ শিশুরই দুটি নিলয়ের মধ্যের দেয়ালে ফুটো থাকে (venticular septal defect)। এই শিশুদের বেশির ভাগকেই উপযুক্ত চিকিৎসা করা যায়, এবং এর জন্য পিতামাতার একটু আগে থাকতেই সজাগ থাকা উচিত, তাহলেই অনেক অকাল মৃত্যু ঠেকান যায়।

হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার জন্য কিছু সাধারণ নিয়মের কথা বলব।

1. খাদ্য—একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের (সাধারণভাবে অল্প পরিশ্রম করলে) দৈনিক 3000 ক্যালোরির মত উত্তাপ প্রয়োজন—যেটা সুষম খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। এই খাদ্য হল 400 গ্রাম শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন—100 গ্রাম ও স্নেহজাতীয় খাদ্য 100 গ্রাম। এর সংগে দেহ-সংরক্ষক খাদ্য অর্থাৎ খনিজ পদার্থ, ভিটামিন ও জল খেতে হবে। স্নেহ জাতীয় খাদ্যের দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়, সরষের তেলের চেয়ে রিফাইন্ড তেল অনেক উপকারি। এতে রক্তের কোলেস্টরলের পরিমাণ ঠিক থাকে। যেটা বেড়ে যায় অতিরিক্ত ঘি, মাখন ও মাংসের চর্বি ইত্যাদি খেলে। কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে ধমনীর দেয়াল আক্রমণ করে এবং হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা নষ্ট করে।

2. ধূমপান ও মদ্যপান সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

3. মানসিক উত্তেজনা যতটা সম্ভব কমাতে হবে।

4. নিয়মিত অল্প ব্যায়াম করা খুবই প্রয়োজনীয়। বয়স্কদের পক্ষে হাঁটা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম।

5. অস্থি সন্ধির অসুখ (Arthritis), যে কোন ভাইরাস অসুখ, কোন কোন ভিটামিনের অভাব জনিত রোগে চিকিৎসকের পরামর্শ সময় মত নেওয়া উচিত কারণ এর যে কোন রোগ থেকে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হতে পারে।

চিত্র ১

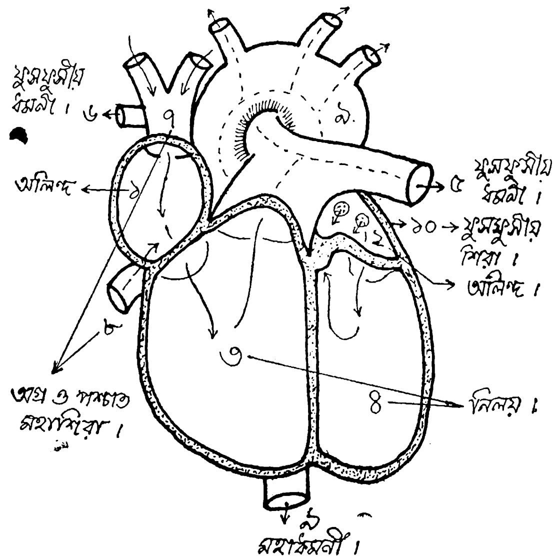

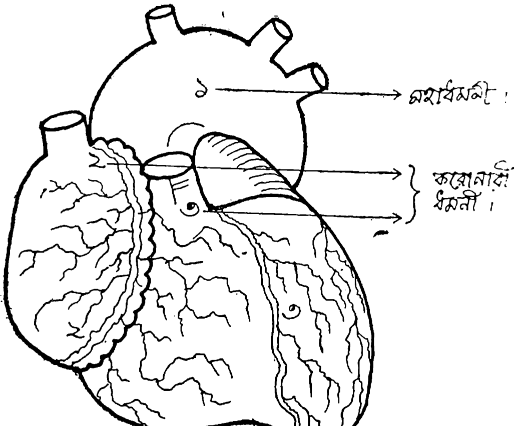

চিত্র ২

ধারাবাহিক উপন্যাস

'দ্য ব্রিজ অন দ্য রিভার কোয়াই' ছায়াছবিটি অনেকেই দেখেছেন। লেখক একজন ফরাসী। নাম, পিয়েরি বোলে (1912)।

'প্ল্যানেট অফ দ্য এপ্‌স্' ছায়াছবিটিও বিশ্ব-বিখ্যাত। একই লেখকের লেখা। ফরাসী ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন জান ফিল্ডিং। বাংলায় এ কাহিনী প্রকাশিত হল এই প্রথম। সামান্য অদলবদল করা হল ছোটদের জন্যে।

এক : মহাশূন্যে কাচের বোতল

মহাশূন্যে ছুটি কাটাতে এসেছে জিন আর ফিলিস। বেশ নিরিবিলি জায়গা। অনেক দূরে দূরে রয়েছে সেই সব নক্ষত্রগুলো যেখানে নিবাস রচনা করেছে নানা রকমের বুদ্ধিমান জীব।

এ কাহিনী যে সময়ের, তখন এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে যাওয়া রোজকার ব্যাপার। এক নক্ষত্র মুলুক থেকে আর এক নক্ষত্র মুলুকে যাওয়াও এমন কিছু বিরাট কাণ্ড নয়—আকছার হচ্ছে। রকেটে উঠলেই হল। ব্যবসা অথবা দেশ বেড়ানো—দুটোই হয়ে যায়।

জিন আর ফিলিস কিন্তু একটু কবি-কবি টাইপের। নতুন বিয়ে করেছে। বড় ভালবাসে মহাশূন্যে বেড়াতে। রকেটে চেপে নয়। নিজেদের পালতোলা মহাকাশ যানে।

লেফাপামোড়া গোলকের মত দেখতে তাদের বিচিত্র মহাকাশযান। লেফাপা অথবা খামটা এক্ষেত্রে গোলকের পাল। খুব মিহি আর হাল্কা। এত হাল্কা যে আলোক বিকিরণের চাপেই ধেয়ে যায় মহাশূন্যপথে। অবশ্য মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র থেকে একটু দূরে থাকতে হয়। সূর্য যে দিকে, পাল তোলা মহাকাশ যান সিধে সরলরেখার পথে ছুটে যায় ঠিক তার উল্টোদিকে। ক্রমশ সূর্য হটে যায় পেছনে।

কিন্তু জিন আর ফিলিসের ডেরা যে নক্ষত্র মুলুকে, সেখানে তো সূর্য একটা নেই—তিনটে! সূর্যকিরণ মহাকাশযানের দিকে ঠিকরে আসে তিন দিক থেকে।

তাই মাথা খাটিয়ে খুশিমত মহাকাশ যান চালানোর একটা পন্থা বার করেছে ফিলিস। পালের ভেতর দিকে কালো খড়খড়ি লাগিয়ে রেখেছে। ইচ্ছে মত এক-একদিকের খড়খড়ি নামিয়ে রাখে— আলোর চাপ এড়িয়ে যায়। পালের যেদিকে খড়খড়ি খোলা, আলোর চাপ লাগে সেইদিকে।

এছাড়াও, খুশিমত রবারের মত, পালকে টেনে বড় বা ছোটও করতে পারে ফিলিস। গতিবেগ বাড়ানোর দরকার হলেই—বাড়িয়ে দেয় পালের ব্যাস। ভয়ানক স্পীডে মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে থাকলেই টিপে দেয় একটা বোতাম। পাল গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে যায়। মহাকাশযান তখন বলতে গেলে থেমেই যায়—ভাসতে থাকে মহাশূন্যে।

গ্রহের ছায়া আর বিশেষ কয়েকটা উপগ্রহের ছায়াকে কাজে লাগিয়ে গতিপথ পাল্টাতে হয় কি করে, সে বিদ্যায়

ফিলিস ও জিন মহাকাশ যানটি নিয়ে ছুটে যাচ্ছে বোতলটির দিকে

জিন নিজেও পোক্ত। সর্বনাশা চৌম্বক ঝড়কেও তোয়াক্কা করে না নক্ষত্র মুলুকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে।

ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করছে দুজনে এক-দৃষ্টে দূরের পানে চেয়ে আচম্বিতে কি যেন ঝলসে উঠল অনেক দূরে...একবার দুবার...তিনবার।

সূর্যের আলোয় ঝলকিত হচ্ছে একটা বস্তু।

বাইনোকুলার তুলে নিল ফিলিস। ফোকাস করল রহস্যময় বস্তুটার ওপর।

বললে অনেকক্ষণ পরে—'খুব বড় জিনিস নয়। কাচের তৈরি মনে হচ্ছে। এদিকেই আসছে দেখছি। দেখতে অনেকটা...'

ভ্যাবাচাকা ভাব ফুটে ওঠে ফিলিসের মুখে। বাইনো-কুলার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় জিন।

চোখে লাগিয়েই সেকি চিৎকার—'আরে! এ যে একটা বোতল!'

'বোতল?'

'হ্যাঁ, বোতল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাল্কা রঙের কাচের বোতল। মুখে ছিপি আঁটা। ভেতরে সাদা মত কি রয়েছে—কাগজ বলেই তো মনে হচ্ছে। নিশ্চয় খবর... খবর পাঠাচ্ছে কেউ!'

'চলো তো গিয়ে দেখা যাক।'

উদগ্র উত্তেজনায় মহাকাশযানকে তৎক্ষণাৎ ঝিকিমিকি বোতলের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল দুজনে। নানা কায়দা করে বোতলকে তুলে আনল মহাকাশযানের ভেতরে।

ছিপির ওপর গালার সীলমোহর। গালার স্তর খুঁটে ছিপি খুলে ফেলল ফিলিস। কিন্তু টেনে বার করতে পারল না ভেতরকার পাকানো কাগজগুলো—এঁটে গেছে বোতলের গায়ে।

তুলে আছাড় মারতেই খান্‌খান্‌ হয়ে গেল বোতল। আপনা থেকেই খুলে গেল পাকানো কাগজের তাড়া। খুব পাতলা কাগজে খুদে অক্ষরে লেখা অনেক কিছু।

অক্ষর দেখেই চিনেছে জিন। পৃথিবীর ভাষা। পৃথিবীতেই তার শৈশব কেটেছে। এ ভাষাও সে জানে। তাই জিন পড়ে শোনালো আশ্চর্য এই কাহিনী!... ...

[ক্রমশঃ]

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

● বিদ্যালয়পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হয়।

● পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয় অনুযায়ী শব্দসংখ্যা হওয়া প্রয়োজন।

● রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি থাকা প্রয়োজন।

● প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের।

● অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

● এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে প্রেরিত রচনাটি অমনোনীত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

● কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।

● প্রতি সংখ্যার মূল্য 4·00 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা 40·00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 35·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।

● গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। Under Certificate of Posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 30·00 টাকা পাঠাতে হবে।

● M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

● 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।

● ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হয়। সংখ্যাপিছু গ্রাহকদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9

সমস্যা কবলিত মহাকাশযান

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

রাকা গ্রহে খবর পাঠাবামাত্র সেখানের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে উত্তর এল— 'সবকিছু হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, যদি মহাকাশ যানেই শিশুটির জন্ম হয় তাহলে কিন্তু একজন কাউকে মহাকাশ যান থেকে বাইরে নিক্ষেপ করতে হবে।'

ওয়্যারলেসে খবর এল, ব্যাপারটা গোপন রাখা গেল না। খবর শোনা মাত্র মাথায় হাত দিয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন।

বাকি চারজন উত্তেজিত হয়ে নিজেদের মধ্যে যে সব আলোচনা করছিলেন তার দিকে তাঁর কান ছিল না। তিনি চিন্তামগ্ন ছিলেন।

তারা এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াতে তিনি বুঝলেন, এরা তাঁকে কিছু বলবেন।

প্রথম অনিলের কথা তাঁর কানে গেল, 'আমাদের চারজনের মধ্যে একজনকে আপনি বাইরে ফেলে দেবেন, এই হুকুম এসেছে ত? কাকে ফেলবেন?'

চারজনকে দেখে নিয়ে তিনি বললেন, 'আমি তো কিছু বলি নি।'

তাঁর কথায় কিন্তু কেউ কান দিল না।

'ব্যাপারটা তো খুনের সামিল'—বলে উঠলেন সুমিতা রায়। 'আমরা সবাই টাকা দিয়ে টিকিট কেটে, সরকারী কাজে রাকায় যাচ্ছি। আপনার হাতে খুন হবার জন্যে আমরা এতে উঠি নি।'

'আপনাকে যখন গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তখন আপনি কাউকে না কাউকে তো ফেলবেনই, আমরা জানতে পারি কি, কাকে ফেলবেন?' লোকেশ বললেন।

'কাউকে ফেলব না।' ক্যাপ্টেন বললেন। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করল না, তা তিনি বুঝলেন। সুমিতা বলে উঠলেন, 'আপনি আমাকে ফেলবেন না তার কোন গ্যারাণ্টি আছে? আমার পেটেই তো সন্তান।'

অনিলের মুখে প্রথম খবরটা শুনলেন ক্যাপ্টেন, 'ভদ্রমহিলার দু' একদিনের মধ্যেই প্রসব হবে।'

'—তুমি কি করে জানলে?'

—'আমারও বৌ আছে। বিয়ে করেছি—কাজেই....'

—'হুঃ! এ তো দারুণ ব্যাপার। ভীষণ বিপদ। আমরা সবাই মারা পড়ব!' ক্যাপ্টেন দাশ অনিলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন। তাঁর মুখে চিন্তার রেখা!

একটি মহাকাশযান রাকা গ্রহের দিকে যাচ্ছে। ভেতরে পাঁচটি প্রাণী। ক্যাপ্টেন দাশ—মহাকাশ যানের চালক। অনিল তাঁর সহকারী। লোহিত ব্যানার্জি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আর লোকেশ নাথ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। এদের সঙ্গে আছেন একজন মহিলা—সুমিতা রায়। তাঁর স্বামী রাকা গ্রহে আছেন, তিনি বোটানিস্ট। প্রথম দুজন ছাড়া বাকি সবাই সরকারি চাকুরে। সকলের রাকায় পোস্টিং হয়েছে।

রাকা গ্রহটিকে মনুষ্য বাসের উপযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেখানের বিষাক্ত গ্যাসগুলিকে রসায়নের সাহায্যে অক্সিজেন ও হিলিয়ামে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। এখন কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করেছেন ঐ ভদ্রমহিলা, তিনি গর্ভবতী এবং তাঁর প্রসব আসন্ন।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'ভদ্রমহিলা যখন মহাকাশযানে উঠলেন তখনই তো তিনি অন্তত চার মাসের গর্ভবতী! তাহলে তিনি এতে চাপলেন কেন?'

অনিল বললেন, 'জানতেন না বোধহয়।'

'হতেই পারে না।'

'হয়ত এর গুরুত্ব বোঝেন নি।'

ক্যাপ্টেন চিন্তিত স্বরে বললেন, 'সমস্যা তো একটা নয়, অনেক। আজ পর্যন্ত মহাশূন্যে কোনো মানব-শিশুর জন্ম হয় নি। এটা অভিকর্ষহীন জায়গা। এখানে কিভাবে কি হয় কে জানে। তার ওপরে আমরা কেউ ডাক্তার নই।'

অনিলও মাথা চুলকাল। ভেবে পেল না কি বলবে।

একটু ভেবে অনিল বললেন, 'পৃথিবীতে খবর পাঠাবেন?'

'লাভ নেই। খবর পৌছাতে অন্তত দেড় দিন, খবর আসতে আরও দেড় দিন। আমরা তার আগেই রাকা গ্রহের অভিকর্ষের ক্ষেত্রে পৌছে যাব।'

অনিল চুপ করে ভাবতে লাগলেন কি বলবে। ক্যাপ্টেন বললেন, 'ডাক দেখি একবার ভদ্রমহিলাকে।'

মহাকাশযানের পেছন দিকে একটা র‍্যাকের মত জায়গা আছে, পর্দা দেওয়া। সেখানে শুয়ে ছিলেন সুমিতা। অনিল গিয়ে ডেকে আনলেন।

'আপনি কি জানতেন যে আগামী চার মাসের মধ্যে আপনার প্রসব হতে পারে?'

'না। ডাক্তার বলে নি কিছু।'

'যদি প্রসব হয় তাহলে কি হবে জানেন? আমরা সবাই রাকা গ্রহে আছড়ে পড়বো,—যানটি ভেঙে যাবে।'

সুমিতা চুপ করে থাকলেন। তার ঘাড় বাঁকা। অনিলের মনে হ'ল ভদ্রমহিলা দারুণ জেদী প্রকৃতির।

সুমিতাকে বিদায় দিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'একটা কিছু করা দরকার। ব্যানার্জীকে ডাক তো।'

সব শুনে ব্যানার্জী বললেন, 'মহাকাশযান ভাঙবে কেন?'

'রাকা গ্রহের অভিকর্ষ পৃথিবীর চেয়ে কুড়ি গুণ বেশি। যদি শিশুটির ওজন পাঁচ কিলো হয়, রাকা গ্রহে তার ওজন হবে একশ কিলো। এই মহাকাশ যানটি ঐ অতিরিক্ত একশ কিলো ওজন বইতে অক্ষম। যানটি ভাঙবেই।'

মিঃ ব্যানার্জী একটু ভেবে বললেন, 'আর কোন সমস্যা নেই?'

'আছে। অক্সিজেনের সমস্যা। এই যানে কিছু লিকুইড অক্সিজেন আছে। সেটা আস্তে আস্তে গ্যাসে পরিণত হয়। আরও একটি প্রাণী এলে তাতে টান পড়বে না?'

'তাহলে আমি কি মহাশূন্যে লাফিয়ে পড়ে আপনাদের সমস্যার সমাধান করব?' তীব্র ভাষায় বলে উঠলেন সুমিতা। সে কখন এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে কেউ বুঝতে পারে নি।

কেউ কোন উত্তর দিল না। তিনজনকে একে একে দেখলেন সুমিতা, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমাকে এই যানের টিকিট দেবার সময় ত' একথা বলা হয় নি যে গর্ভাবস্থায় এতে চড়া নিষেধ। একটা শিশু কত অক্সিজেন নেবে যে আপনারা এত চিন্তিত?'

ক্যাপ্টেন তার দিকে চাইলেন ঠিক সেই দৃষ্টিতে, যে দৃষ্টি পোষা কুকুরের চোখে থাকে—তার মালিক যখন বিনা কারণে তাকে মারে।

ক্যাপ্টেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন না। মহাকাশ যান দরিদ্রের সংসারের মত, এক কণা অতিরিক্ত কিছু থাকে না। এখানে নতুন কাউকে আনা সম্ভব নয়।'

'ওঃ। তা বেশ। আমাকে ধাক্কা মেরে বাইরে ফেলে দেবেন। কিন্তু এখন নয়, আমার বাচ্চাটা জন্মাক, তারপর। আর আমার স্বামী মিঃ রায়কে একটা খবর দেবার ব্যবস্থা করুন।' —কথা কটি বলে দুম্ দুম্ করে চলে গেলেন সুমিতা।

ক্যাপ্টেন দাশ চার্ট দেখলেন। আজ তিরিশ বছর তিনি মহাকাশ যান নিয়ে মহাবিশ্বের নানা দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এমন বিপদে তিনি কখনো পড়ে নি। আরও মুস্কিল এই, রাকা গ্রহে পৌছাতে এখনও প্রায় এক সপ্তাহ বাকি। গ্রহটির সিগন্যাল এখন পাওয়া যাবে না। কেন না রাকার গ্রাউণ্ড স্টেশন গ্রহটির উল্টো দিকে। আর আশ-পাশে—এমন কি রাকা গ্রহেও কোন মহাকাশ যান নেই। কোথাও থেকে কোন সাহায্যের আশা নেই!

এটা যদি পৃথিবী হত? যদি এটা একটা জাহাজ হ'ত আর এরকম বিপদ হত তাহলে? তারবার্তা পাবামাত্র চারদিকে সাড়া পড়ে যেত। কাছের দেশ থেকে উড়ো-

জাহাজ উড়ত—সাহায্যের হাত এগিয়ে আসত চারদিক থেকে।

কিন্তু এখানে কে আছে? কেউ থাকলে তো সাহায্য করবে! সামান্য একটু অক্সিজেনের অভাবে হয়ত—

নাঃ। তিনিও তো সন্তানের পিতা, কারুর সন্তানের অমঙ্গলের চিন্তা করবেন না।

'আমি মরলে ত' আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়।' সুমিতার কথায় ক্যাপ্টেন বর্তমানে ফিরে এলেন।

অনিল বললেন, 'আর আমার চান্স কম কিসে? আমি না থাকলেও চলে, উনি নিজেই তো এটাকে চালাতে পারেন।'

লোকেশ বলে উঠলেন, 'ক্যামেরাটা অফ্ করা দরকার, নইলে সবকিছু রাকা স্টেশনে চলে যাবে।'

'না।' চিৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন দাশ। 'ওসব করলে আমাদের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমরা হারিয়ে যেতে পারি।'

অনিল ক্যামেরার মুখে একটা কাগজ ঢেকে দিলেন। বললেন, 'এতে তো আর যোগাযোগ বন্ধ হবে না। এবার বেতারটা অফ্ করুন দেখি মিঃ ব্যানার্জী।'

বেতার যন্ত্রের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন, 'তা করবেন না, আমি কথা দিচ্ছি, কাউকে ফেলব না, আমায় বিশ্বাস করুন।'

ব্যানার্জী ক্যাপ্টেনের কলার ধরে টানলেন, লোকেশ তাঁর হাত ধরে টানলেন এবং সুমিতা একটা ছোট রুল দিয়ে বার বার আঘাত করতে লাগলেন ক্যাপ্টেনকে।

ক্যাপ্টেন কোন রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিপদমুক্ত হলেন। হঠাৎ সুমিতা দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন দাশ। আমার পেটের বাচ্চার গ্রোথের সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের ওজনও বেড়ে চলেছে গত চারমাস ধরে। কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে এতদিনে তা হতেই পারতো। তা যখন হয়নি, তখন আর মাত্র সাত দিনের মধ্যে বাচ্চার গ্রোথের এমন কিছু পরিবর্তন হবে না যাতে করে মহাকাশযান ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মহাকাশযানের বাড়তি ওজন সমস্যায় আপনি পড়বেন না বলেই মনে হয়।'

'সুমিতা বোধহয় ঠিকই বলছে ক্যাপ্টেন।' বললেন মিঃ ব্যানার্জী।

ক্যাপ্টেন দাশ সুমিতার দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টি প্রশান্ত হয়ে উঠল। অনিল টি. ভি. ক্যামেরার ওপর থেকে কাগজটা সরিয়ে নিল।

কিন্তু এখন নয়…

পরদিন মহাকাশযানটি রাকাগ্রহের অভিকর্ষক্ষেত্রে প্রবেশ করল। ধীরে ধীরে মহাকাশযানটির গতিবেগ বাড়তে লাগল। ক্যাপ্টেন দাশ রাকার গ্রাউণ্ড কণ্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। এরপর যথাসময়ে নির্বিঘ্নে মহাকাশযানটি রাকা স্পেস স্টেশনে অবতরণ করল। মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে তাঁরা দেখলেন মিঃ রায় সুমিতাকে রিসিভ করার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

লাহিড়ী কলেজ, চিরিমিরি, মধ্যপ্রদেশ Pin — 49744

মহাদেশগুলি কি সঞ্চারমান!

চন্দন চ্যাটার্জী

কে একজন আপন খেয়াল বশে মানচিত্র থেকে মহাদেশের ছবিগুলি কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে টেবিলের ওপর সাজিয়ে খেলছিলেন। নানান রকম ভাবে সাজাতে সাজাতে এক সময় অবাক হয়ে দেখলেন যে সব কয়টা মহাদেশই কেমন সুন্দর খাপে খাপে মিলে জুড়ে গিয়েছে। পৃথক পৃথক মহাদেশগুলি একত্রে জুড়ে গিয়ে একটি অখণ্ড স্থলভাগে পরিণত হয়েছে। বার বার সেগুলো সরিয়ে নিয়ে বার বার কাছে নিয়ে এসে জুড়ে দিয়ে অবাক বিস্ময়ে তিনি ভাবতে শুরু করলেন 'কেন এমনটি হয়।' তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে সুদূর অতীতের কোন এক সময়ে অধুনা পরস্পর বিচ্ছিন্ন দূরে এবং বহুদূরে অবস্থিত মহাদেশগুলি ছিল একটিমাত্র অখণ্ড (স্থলভাগ) মহাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সংঘবদ্ধ একটি মহাদেশ। তাহলে নিশ্চয়ই মহাদেশগুলি সমুদ্র বক্ষে ভাসমান এবং কালক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে দূরে সরে গেছে। শান্ত হ্রদবক্ষে ভাসমান দ্বীপ যেমন বায়ুতাড়িত হয়ে স্বস্থান থেকে স্থানান্তরিত হয়। শুরু হলো চিন্তা ভাবনা। সেই প্রাচীন অখণ্ড মহাদেশটি পৃথিবীর সঠিক কোন স্থানে ছিল? ভেঙ্গে এমন টুকরো টুকরোই বা হলো কেন? বিভিন্ন দিকে এত দূরে সরে গেলই বা কেন এবং কিভাবে? এভাবেই জন্ম নিল আর একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদঃ মহাদেশগুলি ভাসমান এবং সঞ্চরণশীল। এটি ব্যাখ্যা করতে জন্ম নিল 'প্লেটটেকনিকের মতবাদ'। প্লেট টেকনিকে বলা হলো মহাদেশগুলি সততঃই সঞ্চরণশীল। এদের এই গতি আজও অব্যাহত রয়েছে। মহাদেশগুলির তলদেশ এক একটি শক্ত প্লেট, এই প্লেটের ঠিক নিচে মসৃণ ও পিচ্ছিল একটি স্তর আছে এবং ঠিক তারই নিচে আরেকটি শক্ত মসৃণ স্তর আছে যার উপর প্লেটসহ মহাদেশগুলি অবস্থিত। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের গভীরে এদের অবস্থিতি। আরও গভীর অভ্যন্তরের অশান্ত উত্তপ্ত অবস্থার ফলে ভূ-ত্বকে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তারই ফলস্বরূপ মহাদেশগুলির গতিশীলতা। এই গতিশীলতার জন্য উপরের প্লেটগুলি পরস্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যায়। এই সঞ্চরণকালে একটি প্লেটের সাথে আর একটি প্লেটের সংঘর্ষ মারাত্মক ফল বহন করে। এক্ষেত্রে একটি প্লেটের তলদেশে আর একটি প্লেট প্রবিষ্ট হয়। পরস্পর প্রবল চাপে সৃষ্টি হয় ভঙ্গিল পর্বতের। হিমালয় পর্বতের সৃষ্টিকে এইভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদিও অন্য ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে।

মহাদেশগুলির সঞ্চরণশীলতা প্রমাণে প্লেট টেকনিক মতবাদের সপক্ষে যুক্তি থাকলেও বিপক্ষে যুক্তিরও অভাব নেই। বিরোধীদের বক্তব্য হল একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলেই হোক বা কোন অতীব শক্তিশালী জ্যোতিষ্কের আকর্ষণেই হোক একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত পৃথিবী একদিন সূর্যদেহ থেকে তার সমুদয় শক্তি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। অন্যান্য গ্রহগুলির জন্মও এইভাবে। মূল উৎস থেকে বহুদূরে (নয় কোটি ছত্রিশ লক্ষ মাইল) নির্বাসিত হওয়ার ফলে ক্রমে পৃথিবী তাপ হারিয়ে শীতল হতে হতে তার বায়বীয় আকারের রূপান্তর ঘটিয়ে উত্তপ্ত তরল গোলকে পরিণত হয়। তারপর ক্রমেই যত তাপ বিকিরণ করে শীতল হতে থাকে ততই এর আকার সঙ্কুচিত হতে থাকে। ক্রমাগত তাপ বিকিরণ করে শীতল ও সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে ঐ উত্তপ্ত তরলের উপর সর জমতে থাকে। কালক্রমে সেগুলিই স্থল ভাগের সূচনা করে। পৃথিবী আজ একটি শক্ত বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। এর ভূ-ত্বক বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি হয়ে পরপর সজ্জিত রয়েছে। কেন্দ্রস্থলটি এখনও উত্তপ্ত ও তরল অবস্থায় রয়েছে। নৈসর্গিক কারণেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হয়ে

সৃষ্টি হয়েছে জল, বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি করেছে। সেই জল পৃথিবী পৃষ্ঠের নিম্ন অংশে আশ্রয় নিয়ে সাগর মহাসাগরের রূপ নিল এবং বায়ু আকাশ-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়ে পৃথিবীকে ঘিরে রাখল। আর ঐ শক্ত স্থলভাগ মহাদেশগুলি সৃষ্টি করল। এ ভাবে যে মহাদেশের (স্থলভাগের) সৃষ্টি সহজেই অনুমান করা যায় যে মহাদেশগুলি ভাসমান অবস্থা বা সঞ্চরণশীলতা একটা অবাস্তব কল্পনা মাত্র।

জড় বস্তু বিকিরণ করে যতই শীতল হয় ততই তার আয়তন সঙ্কুচিত হয়। পৃথিবী তাপ বিকিরণ করে সঙ্কুচিত হয়ে যতই ছোট হতে থাকে ততই এর পৃষ্ঠদেশে সংকোচনজনিত চাপ সৃষ্টি হয়। এই চাপের ফলেই পৃথিবী পৃষ্ঠে ভঙ্গিল পর্বতগুলির সৃষ্টি হয়েছে। হিমালয় পর্বতের সৃষ্টিও এইভাবেই। পৃথিবীর আয়তনের সংকোচনের ফলে পরস্পর বিরোধী দুটি শক্তি কাজ করেছিল। ভূ-পৃষ্ঠের কোন কোন স্থান পরস্পরের নিকটবর্তী হয়েছিল এবং কোন কোন স্থান পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়েছে; অবশ্য সহজেই এ অবস্থাটা ঘটেনি। নানা স্থানে ঘটেছিল প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি। কিন্তু মহাদেশগুলি স্বভাবতই গতিশীল বা সঞ্চরণশীল নয়।

স্থল ভাগের পৃথক পৃথক অবস্থানের জন্য ভূমিকম্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নানা কারণে ভূমিকম্প ঘটে থাকে। ভূমিকম্পের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের প্রভূত পরিবর্তন ঘটে। কোন স্থান স্ফীত হয়ে পর্বতের সৃষ্টি হয়, কোন স্থান সহসা ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে প্রকাণ্ড জলাশয়, হ্রদ বা সমুদ্রে পরিবর্তিত হয়, কোন স্থান আবার সমুদ্রের মধ্য থেকে সহসা উপরে উঠে এসে নতুন স্থলভাগের সৃষ্টি হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠে এমন নিদর্শন প্রচুর ছড়িয়ে আছে। কোন কোন স্থানের একাধিকবার উত্থান পতনের যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি যে এককালে সমুদ্র বক্ষ থেকে উত্থিত হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ক্যাস্পিয়ান সাগর স্থলভাগ বসে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে।

একদা দক্ষিণ ভারত আফ্রিকার সাথে যুক্ত ছিল। মাঝ-খানের ভূভাগ বসে গিয়ে আরব সাগরের সৃষ্টি হয়েছে। সাইবেরিয়াও এক সময় (হিমালয় ও উত্তর ভারতসহ) সমুদ্র বক্ষ থেকে উত্থিত হয়েছিল।

পৃথিবী সংকুচিত হয়ে ছোট হওয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে যে চাপ সৃষ্টি হয় বা টান পড়ে তারই ফলে ভূ-পৃষ্ঠে ফাটল ধরে। তা সমুদ্র তলদেশেও হতে পারে, স্থল-ভাগেও হতে পারে। উত্তর আমেরিকার অ্যারিজোনায় অবস্থিত গ্যাণ্ড ক্যানিয়ন যার মধ্যে দিয়ে কলোরাডো নদী বয়ে চলেছে এমন-ই একটি প্রকাণ্ড ফাটল। এটি গিরি-খাত নয়, কলোরোডো নদীর কোন ভূমিকা এর সৃষ্টিতে নেই। ফাটলটি গভীরতায় দুই কিলোমিটার, চওড়ায় পনেরো কিলোমিটার এবং লম্বায় তিনশত সাত-চল্লিশ কিলোমিটার। প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে এরকম একটি ফাটল 'মারিয়ানাস ট্রেঞ্চ' যার গভীরতা 11,040 মিটার। মহাদেশগুলির আকৃতি চিরকালই একরূপ নয়। বর্তমানে এদের যে আকৃতি অতীতে এমন অবশ্যই ছিল না। ভবিষ্যতেও এমন থাকবে না। মহাদেশগুলির সঞ্চারণ মতবাদের প্রবক্তাদের ধারণা যে মহাদেশগুলির আকৃতি চিরকালই একইরূপ, তা না হলে মানচিত্র থেকে কেটে নেওয়া মহাদেশগুলো টেবিলের উপর খাঁজে খাঁজে মিলে গেল কেন?

স্ট্রিট নং 23, কোঃ 97/8. পোঃ চিত্তরঞ্জন-713365

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

অমরনাথ রায় প্রণীত

স্টুডেণ্টস্ নলেজ গাইড (১ম ও ২য়)

প্রথম খণ্ড : VI—VIII—10 থেকে 14 বছর বয়সের জন্য

দ্বিতীয় খণ্ড : IX—X—14 থেকে 16 বছর বয়সের জন্য

প্রতি খণ্ড 12 টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9

বিজ্ঞান প্রচারক স্বর্ণকুমারী দেবী

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

বাংলার নবজাগরণে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির নাম কে না জানে। পূর্ব ও পশ্চিমের ভাল জিনিসগুলি ছেঁকে নিয়ে তার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁরা সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি নানা দিকে সৃষ্টির নতুন জোয়ার এনে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, জীবনযাত্রার ধরনে তাঁরা এমন এক নতুন ধরনের সুস্থ সহজ, সুরুচিপূর্ণ ধারার প্রবর্তন করেছিলেন যা এখনও আদর্শ বলে মনে করা হয়। অথচ এই নবজাগরণে একটা দিক কি জানি কেন প্রায় অনাদৃত থেকে গেল। এই দিকটি ছিল বিজ্ঞান।

অথচ পশ্চিমে তখন বিজ্ঞানের আলো প্রবলতর হয়ে জ্বলছে, সকলেই বুঝতে পারছে কি বিপুল এর সম্ভাবনা। একথা ঠিক যে ইংরেজ প্রভুরা মোটেই চায়নি ভারতীয়রা বিজ্ঞানের সাহায্যে নিজেদের উন্নতি করুক, তবে যে সব ভারতীয় নিজেদের চেষ্টায় পশ্চিমের বিজ্ঞানের খবর পাচ্ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ উঠে পড়ে লেগেছিলেন সংস্কৃত ভিত্তিক শিক্ষার বদলে আধুনিক বিজ্ঞানের পত্তন করতে। রামমোহন রায় ছিলেন এঁদের মধ্যে প্রধান। অথচ ঠাকুর বাড়ির বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে এলেও বিজ্ঞানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। তবে সকলে নয়। এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথের সাত বছরের বড় দিদি।

স্বর্ণকুমারী বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে লিখতে শুরু করেন। আলাদা ভাবে বই লেখেন। তবে ভারতীয় সম্পাদক হিসেবেই তিনি বিজ্ঞান প্রচারকের সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা নেন। মনে রাখতে হবে কিছু কিছু স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞান বই প্রকাশিত হলেও সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজ ভাষায় তখন বড় একটা কিছু লেখা হত না। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানরহস্য কয়েক বছর আগে বেরিয়েছে. তাতে তিনি সৌরজগৎ, চন্দ্রলোক, গগন পর্যটন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। মনুষ্য ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি ও ভবিষ্যত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ফসিল প্রসঙ্গও এনেছেন।

বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখনও লিখতে শুরু করেন নি। এই সময় আবির্ভাব হল স্বর্ণকুমারীর। আবির্ভাব কথাটা তাঁর সম্পর্কে খুবই উপযুক্ত। কারণ তাঁর আগে বা পরে এরকম তীক্ষ্মবুদ্ধি, বিজ্ঞানবোধ সম্পন্ন লেখক বড় একটা দেখা যায় নি— মেয়েদের মধ্যে তো আজও তিনি এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়ে আছেন। এখনও আমরা জানি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখা মোটেই ছেলেখেলা নয়। তার জন্য বিষয়টি ভালো করে বুঝতে হবে, ভাব প্রকাশ করার জন্য বাংলা ভাষার উপর যথেষ্ট দখল থাকতে হবে; শব্দচয়ন নিখুঁত হতে হবে এবং সবচেয়ে যা বেশি দরকার—নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য থাকতে হবে। স্বর্ণকুমারী এর সব দিক দিয়েই আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। পরিভাষা নিয়ে অনেক পরে পণ্ডিতেরা কমিটি তৈরি করেছেন, আলাপ আলোচনা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। স্বর্ণকুমারীর সামনে নিজের বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু ছিল না। এমন কি জোড়াসাঁকোর প্রতিভাবান ঠাকুর পরিবারেও এমন কেউ ছিলেন না যিনি তাঁকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। তবু দেখ তাঁর লেখার স্টাইল কি চমৎকার, কি সহজবোধ্য ঃ

'লাইরা (Lyra) রাশির সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারাটির কথা আমি লিখতে চাই—কিরূপে লিখিব? আমাকে লিখিতে হইবে a lyra। এখানে লাইরা শব্দটি ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হইয়া—তাহার আগে a অক্ষর বসিয়াছে—ইহার অর্থ লাইরার a। বাংলায় লিখিতে হইলে আমরা লিখিব ক-লাইরা, কিম্বা লাইরার ক। a Ursae Minoris কিম্বা আর্যা মাইনরের ক বলিলে বুঝিতে হইবে উক্ত রাশির সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারকাটি।'

জাহাজে করে মাদ্রাজ যাবার সময় তাঁর প্রথম ইলেকট্রিক আলো দেখার অভিজ্ঞতাও বেশ মজা করে লেখা। এই ভ্রমণ কাহিনীটি বেরোয় 1302 সালের 'ভারতী'তে।

'6টায় ডিনারের পূর্ব ঘণ্টা, সাড়ে ছটায় দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিতে নিচে আসিয়া দেখিলাম পথে পথে ঘরে ঘরে বিদ্যুতালোকের জ্যোৎস্না। ধূম নাই, গন্ধ নাই, জ্বালাইতে নিভাইতে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই, দীপ সংলগ্ন ক্ষুদ্র কলদণ্ড উঠাও, দপ করিয়া সহসা জ্বলিয়া উঠিবে, নামাও তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে। সে দিন ক্যাবিনে আসিয়া আমি কতবার যে বিদ্যুৎ-প্রদীপের কানটা উপর নিচে নাড়া দিয়াছিলাম তাহার ঠিক নাই। কলিকাতায় ঘরে ঘরে পথে পথে কবে এইরূপ বিদ্যুতালোক জ্বলিবে?'

এখন দেখা যাক স্বর্ণকুমারীর ব্যবহার করা পরিভাষাগুলি কেমন ছিল। পেনামব্রাকে তিনি বলেন উপচ্ছায়া। এই শব্দটি এখনও স্বীকৃত। ইংরিজী শব্দ ইউনিভার্সের তিনি বাংলা করেন বিশ্বাকাশ। খুবই সুন্দর শব্দটি—তবে এটি এখন স্বীকৃত পরিভাষা নয়। সূর্যের ক্রোমো-

স্ফিয়ারকে বর্ণমণ্ডল ও ফটোস্ফিয়ারকে আলোকমণ্ডল বলে উল্লেখ করেন তিনি। সৌরকলঙ্ক, সৌরবিশ্ব প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন সোলার স্পট বোঝাতে। তাঁর গঠন করা শব্দগুলি সহজ ও ভাব প্রকাশের উপযোগী। মোটেই কটমট নয়। তার অনেকগুলি বাংলাতে চালু হয়ে গেছে।

একথা ঠিক যে 'ভারতী' সম্পাদনার ভার হাতে না এলে হয়ত এইসব লেখা অপ্রকাশিত থেকে যেত। এক সময় 'ভারতী' উঠে যাবার উপক্রম হয়। তখন পত্রিকাটিকে বাঁচাবার দায়িত্ব এসে পড়ে স্বর্ণকুমারীর উপর। সেটা বাংলা 1291 সাল। তার আগে সম্পাদক ছিলেন তাঁর মেজদা দ্বিজেন্দ্রনাথ। প্রথম সম্পাদকীয় লেখার সময় স্বর্ণকুমারী বেশ স্পষ্টভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন এবং এটাও বেশ জোরের সঙ্গে জানান যে বিজ্ঞান শেখা এখনকার দিনে বিশেষ দরকার এবং সেইজন্যই এখন থেকে ভারতীতে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান বিষয়ে নানা রকম লেখা প্রকাশ করা হবে। তাঁর নিজের কথায়ঃ

'আমাদের মতে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উপকারিতা আছে এবং আজকাল এদেশে বিজ্ঞান আলোচনার কতক অনুরাগও দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ আজকাল বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন অথচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ইউরোপীয় কোন ভাষার সহিত পরিচয় না থাকায় তাঁহারা বর্তমান কালের বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে অপারগ, তাহা ছাড়া ইংরাজী জানিয়াও অনেক স্ত্রী পুরুষ অধিক সময় বা অর্থ দিয়া বিজ্ঞান আলোচনা করিতে পারেন না; সেইজন্য ভারতীতে সহজ ভাষায় বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনার বিশেষরূপে ইচ্ছা রহিল।'

যে কথা সেই কাজ। স্বর্ণকুমারী নিজেই কলম ধরলেন—দেশ বিদেশের বিজ্ঞান সংবাদ বাঙালী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিলেন, বিদেশের জ্ঞানীগুণীদের আবিষ্কৃত তথ্য ও ধারণার ভিত্তিতে লিখলেন—সূর্য, তারকাজগৎ ও মহাবিশ্বের কথা, লিখলেন অন্য গ্রহে জীবের অস্তিত্ব থাকতে পারে কি না সে বিষয়ে বিশ্লেষণ, পদার্থের চতুর্থ অবস্থার মত দুরূহ বিষয়েও তিনি লেখেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি নিজে ভাল সংস্কৃত জানতেন বলে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক ভাবধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন ইউরোপীয় নব্য বিজ্ঞানের এবং দেখিয়েছেন কোথায় ভারতীয় ভাবধারায় ঘাটতি ছিল। আর্যভট ও ভাস্করাচার্য থেকে অনর্গল উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন অনেক তথ্য এদেশে আগেই জানা ছিল। এইভাবে, তাঁর মতে 'পৌরাণিক আখ্যান বিজ্ঞানের ভাষায় অনুবাদ করিলে অনেক লুক্কায়িত সত্য উদ্ধার হইতে পারে।'

বিজ্ঞান যে ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে এগোতে পারে নি, মাঝে মাঝেই বহিঃশত্রুর আক্রমণে বা অন্য কারণে তাতে ভাটা পড়েছে এইসব ইতিহাস সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী সচেতন ছিলেন। দেশের ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ। তিনি খুব নিরপেক্ষভাবে বর্তমান ইউরোপের উন্নতির কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, তাদের সঙ্গে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গির মূল প্রভেদ কোথায় ছিল সেটাও দেখিয়েছেন। তিনি উগ্র আধুনিকদের বক্তব্য খুব সমর্থন করতেন না। তিনি এক জায়গায় লেখেন, অনেকের মত প্রাচীন সাহিত্য পড়ে কোন লাভ নেই—এখন শুধু আধুনিক বিজ্ঞান পড়া দরকার। কিন্তু তা ঠিক নয়। ইতিহাসকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান এগোতেই পারে না। অতীত ইতিহাসের মধ্যে দিয়েই আমরা এগিয়ে চলি—পূর্ব-পুরুষদের উন্নতির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়েই আমাদের যেতে হবে। সভ্যতার এই বিভিন্ন স্তরের কোন একটিকে বাদ দিলে উন্নতির আশা নেই।

স্বর্ণকুমারীর লেখাগুলি আলাদা করে বই আকারে প্রকাশিত হলে বোঝা যাবে তিনি নিজে বিজ্ঞানী বা গবেষক না হয়েও কতটা বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন এবং দেশের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান কেন কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে বিষয়ে তাঁর চিন্তা কতটা পরিষ্কার ছিল। দুঃখের বিষয় আজ থেকে একশো বছর আগে একজন মহিলার পক্ষে এর চেয়ে সক্রিয় আর কোন কাজ করা সম্ভব ছিল না। যদি তিনি পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে নিশ্চয় বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার কাজে মহেন্দ্রলাল সরকারের পাশে এসে দাঁড়াতে পারতেন। তবে সম্ভবত তাঁরই অনুপ্রেরণায় তাঁর কন্যা সরলা মহেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স অ্যাসো-সিয়েশনে বক্তৃতা শুনতে আসতেন। তখন মেয়েদের স্কুল কলেজে পড়ার তেমন প্রচলন ছিল না। পাশ করা মেয়েদের দেখতে রাস্তায় ভীড় জমে যেত। তার উপর ছেলে বা মেয়ে কারও পক্ষেই উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চার কোন রকম সুযোগ ছিল না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য এবং ভারতীয়দের মধ্যে গবেষণায় উৎসাহ বাড়াবার জন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল এই সংস্থার পত্তন করেন। প্রথম দিকে এখানে বিখ্যাত পণ্ডিতেরা এসে বিজ্ঞানের নানা শাখায় বক্তৃতা দিতেন। তা শোনার জন্য ভীড় করে কলেজের ছাত্ররা আসত। সরলাদেবীও আসতেন, তাঁর সঙ্গে থাকতেন দুই দাদা। তবে যে কোন কারণেই হোক সরলাদেবীর বিজ্ঞানে উৎসাহ বেশিদিন থাকে নি।

স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ছিল সহজাত। তিনি যা কিছু পড়েছিলেন সবই নিজের চেষ্টায়। তবে পারিবারিক আবহাওয়া তাঁকে সাহায্য করেছে এটাও ঠিক। কলেজে গিয়ে তিনি বি. এস-সি পাশ করেন নি। তবু তিনি অদম্য উৎসাহে স্কুলপাঠ্য ভূগোল বই লিখেছেন। পৃথিবী নামে এই বইতে পৃথিবীর উৎপত্তি, গতি, ভূগর্ভ, পরিমিতি ইত্যাদি বিষয়ে তখনকার প্রচলিত মতবাদগুলি সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। তখন ভূগোল বিষয়ে

বাংলায় বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে—তার সবই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। মজার কথা, এই বাংলায় প্রথম ভূগোল বই লেখেন কয়েকজন বিদেশী। তবে বাংলা শিখে লেখা বলে সেই সব বইয়ের ভাষাও বেশ আড়ষ্ট। এদের মধ্যে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের লেখা একটি বইয়ের থেকে একটু উদ্ধৃতি দিলেই বুঝতে পারবে সে লেখার বক্তব্য ও স্টাইল কিরকম হাস্যকর :

'কেহ কহেন যে পৃথিবী চতুষ্কোণী ও কেহ কহেন ত্রিকোণা। কিন্তু সূর্য সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থেতে কহেন যে পৃথিবী কদম্ব পুষ্পের ন্যায় গোলাকৃতি।'

একই সময়ে লেখা হলেও স্বর্ণকুমারীর মন ছিল যুক্তিবাদী ও আধুনিক। বিদেশী বিজ্ঞানীদের মত উল্লেখ করার সময়েও কিন্তু তিনি ভারতীয় পটভূমির কথা মনে রেখেছেন। তিনি সব সময়েই চিন্তা করেছেন কিভাবে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কাজ করলে দেশের উন্নতি হয়, বিজ্ঞানের চর্চা করে বুদ্ধির বিকাশ লাভ হয়। আবার তাঁর লেখায় ফিরে আসি :

'ইউরোপে এখন যেরূপ দ্রুতপদে বিজ্ঞান অগ্রসর হইতেছে তাহা অতি আশ্চর্যজনক। ফরাসী পণ্ডিত রেনাঁ বলেন, আর এক শতাব্দীর পর বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোন বিদ্যারই মনুষ্যমণ্ডলীতে চর্চা থাকিবে না। এক শত বৎসর পরে কি হইবে বলা বড় দুঃসাধ্য তবে মনুষ্যজাতির মধ্যে না হউক ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞান ক্রমেই যে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য বিস্তার করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল জ্ঞানগত উন্নতি ছাড়া বিজ্ঞান প্রসঙ্গে বাণিজ্য, শিল্প, চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যবহারগত বিষয়েও উক্ত দেশবাসীগণ দ্রুত পদে অগ্রসর হইতেছেন। বিজ্ঞানের উন্নতি না হইলে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না, বিজ্ঞানের কার্যগত শিক্ষার অভাবেই ইউরোপীয় জাতি হইতে আমরা সকল বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। যাহাতেই উন্নতি করিতে চাও বিজ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক হইবেই।'

হঠাৎ পড়লে মনে হয় যেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কিংবা মেঘনাদ সাহার লেখা পড়ছি—জাতীয় উন্নতির উপায় হিসেবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার কথা তাঁরা বার বার বলেছেন, লিখেছেন এবং কাজেও করে দেখিয়েছেন। কাজে করে দেখান স্বর্ণকুমারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না—তাঁর যুগে অনেক রকম বন্ধন, অনেক বাধা নিষেধ ছিল। তবু তারই মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা ছিল। তিনি চিন্তার দিক দিয়ে কত আধুনিক ছিলেন ভেবে আজ আমরা অবাক হই।

168/47, লেক গার্ডেনস, কলকাতা-45

পড়াশোনা

মজার গুণফল

শান্তি নন্দী

নিচের গুণগুলি দেখলে বুঝতে পারা যাবে কিভাবে গুণ করা হয়েছে ?

43 − 3 = 40	75 − 5 = 70	106 − 6 = 100
38 + 2 = 40	66 + 4 = 70	95 + 5 = 100
1634	4950	10070
32 − 2 = 30	207 − 7 = 200	308 − 8 = 300
29 + 1 = 30	194 + 6 = 200	293 + 7 = 300
928	40015	

প্রথমে 3কে 2 দ্বারা গুণ করলে হয় 6। 40 থেকে 6 বিয়োগ করলে হয় 34, গুণফলের ডানদিকে বসানো হল। 40 এর 4 ধরতে হবে। 4কে বর্গ করলে হয় 16। 34-এর আগে বসানো হল।

5কে 4 দ্বারা গুণ করলে হয় 20, 70 থেকে 20 বিয়োগ করলে হয় 50। গুণফলের ডানদিকে বসানো হল। 70-এর 7 ধরতে হবে। 7কে বর্গ করিলে হয় 49। 50-এর আগে বসানো হল।

6কে 5 দ্বারা গুণ করলে হয় 30। 100 থেকে 30 বিয়োগ করলে হয় 70। গুণফলের ডানদিকে বসানো হল। 100-এর 10 ধরতে হবে। 10কে বর্গ করলে হয় 100। 70-এর আগে বসানো হল।

2কে 1 দ্বারা গুণ করলে হয় 2। 30 থেকে 2 বিয়োগ করলে হয় 28। গুণফলের ডানদিকে বসানো হল। 30-এর 3 ধরে বর্গ করলে হয় 9। 28-এর আগে 9 বসানো হল।

7কে 6 দ্বারা গুণ করলে হয় 42। 200 থেকে 42 বিয়োগ করলে হয় 158। তা বসানো হল। 200-এর 20 ধরে বর্গ করলে হয় 400। তা বসানো হল।

8কে 7 দ্বারা গুণ করলে হয় 56। 300 থেকে 56 বিয়োগ করলে হয় 244। তা বসানো হল। 300-র 30 ধরে বর্গ করলে হয় 900। তা বসানো হল।

এখানে মোট যোগফল, 10, 20, 30, 40, 50, 60 70, 80, ···, ···,হতে হবে এখানে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এইভাবে ধরতে হবে। −6 ধরলে 5 ধরতে হবে। −8 ধরলে +7 ধরতে হবে। 106 − 6 = 100, 95 + 5 = 100। 106-এর সঙ্গে 95 গুণ করলে ঐ পদ্ধতিতে হবে।

Ambikapur, Ramkrishnapur Natagarh,
Sodepur, 24-Parganas.

গাছপালার গল্প

অরবিন্দ ঘোষ

পাগলা গাছ

মানুষ আর জীবজন্তু যেমন পাগল হয় তেমনি গাছও পাগল হয় কিনা জানা নেই, তবে এই গাছটির খামখেয়ালীপনা চরিত্রের জন্য এর নাম হয়েছে পাগলা গাছ এবং ইংরেজিতে এর নাম ম্যাড্‌ট্রি। পাগলাগাছের পোষাকীনাম – স্টারকুলিয়া এ্যালাটা ভ্যারাইটি-ডাইভার-সিফলিয়া। স্টারকুলিয়েসী পরিবারভুক্ত এই বৃক্ষের আদি জন্মস্থান ভারত ও বর্মার উষ্ণাঞ্চলে। পৃথিবীতে স্টার-কুলিয়াগণের প্রায় 100টি প্রজাতি রয়েছে তাদের বেশিভাগেরই উৎপত্তিস্থল এশিয়া-মহাদেশের উষ্ণাঞ্চলে। ভারতে এদের 8—10 টি প্রজাতি রয়েছে তারমধ্যে কিছু-প্রজাতি সরলাকৃতি কাঠের জন্য জঙ্গলে চাষ করা হয়। এ গাছের উচ্চতা প্রায় 80—100 ফুট পর্যন্ত হয়, বেশি উঁচু হওয়ার জন্য শকুনেরা গাছে বাসা বাঁধে। পাগলাগাছের পাগলামীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—এর প্রত্যেকটি পাতা বিভিন্ন আকৃতির অর্থাৎ একটি পাতার আকৃতির সঙ্গে অন্য কোন পাতার মিল নেই। সেগুনপাতার মতো বড় চওড়া পাতার কিনার বিভিন্ন আকৃতির খাঁজকাটা, বড় অদ্ভুত ধরনের। পাগলাগাছের এই অদ্ভুত চরিত্রের জন্য এরা উদ্ভিদপ্রেমিকদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় ও মনে কৌতূহল জাগায়। একে সচরাচর দেখা যায় না তাই দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদও বলা চলে। সমভূমির উষ্ণাঞ্চলের প্রায় সব রকম মাটিতেই একে চাষ করা চলে, সাধারণত বীজ থেকে চারা তৈরি করা হয়। ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে গাছে থোকা থোকা ক্ষুদ্রাকার ফুল ফোটে পরে পাতা ঝরে পড়ে এবং পুনরায় নতুন পাতা গজায়। কলকাতার এগ্রি-হর্টিকালচার বাগানে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

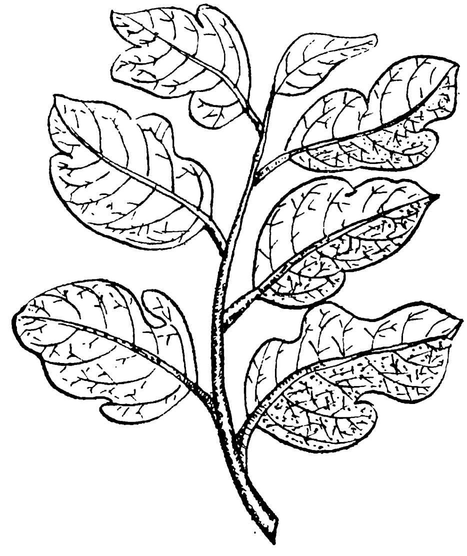

পাগলা গাছ

উদ্যান ও কানন শাখা, কোচবিহার।

জীবাশ্ম উদ্ভিদ

জীবন্ত জীবাশ্ম উদ্ভিদ কথাটা শুনে মনে কিরকম একটা খটকা জাগে, মনে হয়—সেটা আবার কি! জীবাশ্ম বা ফসিল-তো কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর পাথরে রূপান্তরিত নাম, সেই পাথর কি কখনও জীবন্ত হয়? কিন্তু হ্যাঁ? কখনও কখনও হয়েছে আর সেই-জন্যেই তো খবরটা রীতিমতো চাঞ্চল্যকর এবং উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ-দের কাছে এনে দিয়েছে এক নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

দার্জিলিং বোটানিক গার্ডেনে রোপণ করা হয়েছে এক শ্রেণীর বৃক্ষ যার নাম—মেটাসিকুয়া এবং এটাই হ'ল জীবন্ত জীবাশ্ম উদ্ভিদ। ট্যাক্সোডিয়েসী পরিবারভুক্ত এই বৃক্ষটির বৈজ্ঞানিক নাম—মেটাসিকুয়া গ্লিপটোসট্রোবয়েডস্ এবং এটাই হ'ল মেটাসিকুয়াগণের একমাত্র প্রজাতি। চীনদেশের অধিবাসী এই বৃক্ষের এদেশে প্রথম পরিচিতি ঘটে দার্জিলিং বোটানিক গার্ডেনের মাধ্যমে প্রায় 22 বছর আগে। ঠাণ্ডা জলবায়ুর উপযোগী এই বৃক্ষের পছন্দ 5—15° সে.গ্রে. তাপমাত্রা এবং আদ্রপরিবেশ। হালকা দোঁয়াস মাটি বেশি পছন্দ করলেও প্রায় সব ধরনের পাহাড়ী মাটিতে বেঁচে থাকতে পারে।

মেটাসিকুয়া বৃক্ষ ও পাতা দেখতে এদেশের তেঁতুল বা বাবলা গাছের মতো। উপযুক্ত পরিবেশে 115 ফুট উচ্চতা হ'লেও এদেশে 30-40 ফুটের বেশি দীর্ঘ হয় না। গাছের গুঁড়ি লালচে বা তামাটে রঙের এবড়ো-খেবড়ো শক্ত মজবুত গড়ন বেশ মনোরম। চিরুণীর মতো সজ্জিত যৌগিক সবুজপাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, লম্বায় অর্ধ ইঞ্চি, সূক্ষ্মাগ্র, রেখাকার শীতে পাতা ঝরে পড়ে। বীজ থেকে বংশবৃদ্ধি হলেও এদেশে এখনও বীজ দেখা যায়নি তবে সহজেই গুটিকলম দ্বারা বংশবিস্তার করা যায়।

এই চমকপ্রদ জীবনেতিহাস সর্বস্তরের উদ্ভিদপ্রেমিকের কাছে এক অভিনব ঘটনা হয়ে রয়ে গেছে। তবে 1941 খৃঃ বৃক্ষটি আবিষ্কৃত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন শীতোষ্ণ অঞ্চলের বোটানিক গার্ডেনে এই দুষ্পাপ্য বৃক্ষটির চাষ করা হয়েছে।

এইচ. জি. ওয়েলসের
দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস
বাণীরূপ - অনিল কর্মকার
চিত্ররূপ — গৌতম কর্মকার
বেলা তখন প্রায় তিনটে। বুম বুম শব্দে নগরীর বাড়ীঘর হঠাৎ কেঁপে কেঁপে উঠলো। আমাদের সেনাদল তখন কামান দাগতে শুরু করেছে। আহ, কী আনন্দ! সামান্য দু'টো চোঙ, আর শুঁড়ওয়ালা কয়েকটা জীব! কতোক্ষণ ওরা পারবে? আমাদের ভারী পাল্লার বড় বড় কামান···
বু-উ-উ-ম !! উঃ- কী ভয়ঙ্কর গর্জন! টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালাগুলো পর্যন্ত ঝন ঝন করে উঠলো। দেখলাম- একটা সবুজ রশ্মি জ্বলন্ত মৃত্যুর মতো নাচতে নাচতে যাচ্ছে। গাছগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। কলেজের ছাদ, গির্জার চূড়া-সব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগলো।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর মুখোমুখি হোল, তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন – মঙ্গলের বুকে একটা উজ্জ্বল আলোর ঝলক। রাত ঠিক বারোটায়। মিনিট
পনেরোর মধ্যেই আলোটা মিলিয়ে গেল।
আশ্চর্য ব্যাপার, স্পেকট্রোস্কোপে যে বর্ণালি আমি দেখলাম, তাতে মনে হোল – একটা জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড যেন উল্কার বেগে ছুটে আসছে।
এই পৃথিবীর দিকেই।
সত্যি! কিছুদিন থেকে তো শুনছিলাম – আলোক-বিন্দুটা চঞ্চল হয়ে মঙ্গলে ছুটোছুটি করছে। ওরা কি তবে পৃথিবীর দিকেই আসছে? আমাদের আক্রমণ করবে?
দূ-র! তা-ও কখনো হয়?
কেন হয় না?
পণ্ডিতেরা বলেন – ঠাণ্ডা হতে হতে সব গ্রহই একদিন মরে যাবে। মঙ্গলের সেই মরণদশাই তো এখন ঘনিয়ে আসছে। কাজেই মঙ্গলের যারা বাসিন্দা, তাদের কাছে এখন একমাত্র ভরসা – পৃথিবী।
গৌতম কর্মকার
2

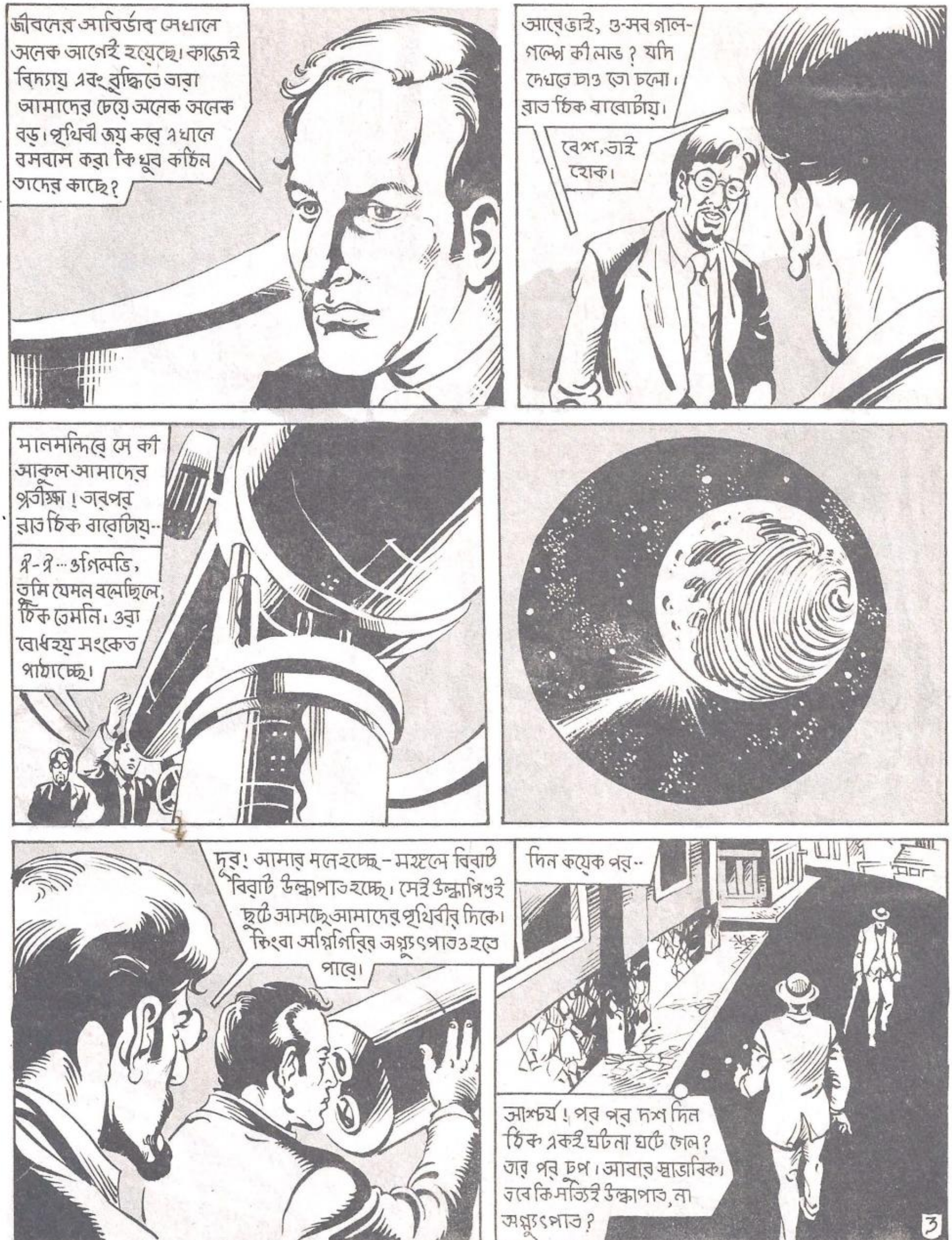
জীবনের আবির্ভাব সেখানে অনেক আগেই হয়েছে। কাজেই বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে তারা আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বড়। পৃথিবী জয় করে এখানে বসবাস করা কি খুব কঠিন তাদের কাছে?
আরে ভাই, ও-সব গাল-গল্পে কী লাভ? যদি দেখতে চাও তো চলো। রাত ঠিক বারোটায়।
বেশ, তাই হোক।
মানমন্দিরে সে কী আকুল আমাদের প্রতীক্ষা! তারপর রাত ঠিক বারোটায়···
ঐ-ঐ···ওগিলভি, তুমি যেমন বলেছিলে, ঠিক তেমনি। ওরা বোধহয় সংকেত পাঠাচ্ছে।
দূর! আমার মনে হচ্ছে – মঙ্গলে বিরাট বিরাট উল্কাপাত হচ্ছে। সেই উল্কাপিণ্ডই ছুটে আসছে আমাদের পৃথিবীর দিকে। কিংবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও হতে পারে।
দিন কয়েক পর··
আশ্চর্য! পর পর দশ দিন ঠিক একই ঘটনা ঘটে গেল? তার পর চুপ। আবার স্বাভাবিক। তবে কি সত্যিই উল্কাপাত, না অগ্ন্যুৎপাত?
3

মনে হয় - অতিকায় কামানের সাহায্যে ওরা বিরাট বিরাট গোলা ছুঁড়ছে এই পৃথিবীর দিকে।
এইভাবেই তারা দশ দশটি মহাকাশযান দশদিন পাঠিয়েছে। একই সময়ে- একই স্থান থেকে। সেই আলোকরশ্মিই আমরা দেখেছি।
পরের দিন রাতে আমি পড়ার ঘরে মগ্ন ছিলাম। তখন শেষরাত ···
জ-জ-জ
তা-রা! তারা খসে পড়লো একটা!
ওটা মনে হয় উল্কাপাত।
পরের দিন সকাল। হাঁটতে হাঁটতে ওগিলভি এক বালুকাময় প্রান্তরে পৌঁছলেন।
আরে, দূরে ঐ ঢিলার মতো জায়গাটা! কই, আগে তো ওটা দেখিনি! একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি।
উঃ-কী প্রচণ্ড বেগেই না এখানে আছড়ে পড়েছে উল্কাটা। বেশীর ভাগ অংশই মাটির নিচে। বালি পাথর ছিটকে দিয়ে কী গহ্বরটাই না করেছে!
4

নীল দেশে

প্রচেতারঞ্জন নন্দী

সকালবেলা উঠেই খবরের কাগজ দেখাটা বাবা কাকাদের মতো আমারও একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন স্কুলের পরীক্ষা মিটে গেছে। তাই এখন একটু বেলা করেই ঘুম থেকে উঠি। আর আমার ঘুম থেকে উঠতে উঠতে বাবা কাকাদের কাগজ পড়া হয়ে যায়। তাই আমি ঘুম থেকে উঠেই কাগজটা পেয়ে যাই।

আজকে যেন ঘুম থেকে অর্থাৎ বিছানা ছেড়ে উঠতে ভালো লাগছে না। রাত্রে গরমের জন্য ভালো ঘুম হয়নি। যা হোক মায়ের বকুনির ভয়ে উঠতেই হলো। খবরের কাগজটা হাতে নিলাম। আরে! অবাক কাণ্ড! প্রথম পাতায় বড় বড় হেডিং-এ লেখা—'বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিস্টার হার্ডসন গতকাল থেকে নিখোঁজ হয়েছেন।' এবার এ সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ এক নিমেষে পড়ে ফেললাম। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মিস্টার হার্ডসন খুব ভালো লোক ছিলেন। ওনার সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় আছে। উনি থাকেন আমার মামার বাড়ির পাশেই, কোলকাতায়। আমার মামাই ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিয়েছিলেন।

যাই হোক সেই দুঃসংবাদ পড়ার পর থেকে মনটা খারাপ ত হয়েই গেল আর সময় তাঁর সেই সদাহাস্যময় মুখ মনে পড়তে লাগল। তারপর পড়াশোনা আর ভালো লাগে না। পাশের বাড়ির টোটনকে নিয়ে খেলতে গেলাম। কিছুই ভালো লাগে না। এই রকম অন্যমনস্কভাবে সারাদিন কেটে গেল। খালি মিস্টার হার্ডসনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। রাত্রে সামান্য কিছু খেয়েই শুয়ে পড়লাম। কিছু ভালো লাগছে না। কেবল চিন্তা আর চিন্তা। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম খেয়ালই নাই।

জানলা দিয়ে যেন হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা গোল মতো বস্তু পাশের বল খেলার মাঠের উপর নামল। চুপিসারে দরজা খুলে পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। সেটা দেখতে ঠিক কি রঙের তা বলতে পারব না। কেননা সেটি থেকে ক্ষণে ক্ষণে নানা রঙ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তবে সেটি ঠিক একটা বৃত্তের মতো। কৌতূহল বশে তার গায়ে যেই হাত দিয়েছি অমনি সমস্ত আলো নিভে গিয়ে খুট করে একটা শব্দ হলো আর সেটির খানিকটা অংশ ফাঁকা হয়ে তার থেকে যারা বেরিয়ে এল তাদের দেখে আমার পেট থেকে বগবগিয়ে হাসি বের হতে লাগল। তাদেরকে কি বলব ঠিক করতে পারছি না। তাদের একেবারে বেঁটে দুটি হাত, দুটি পা, সবই মানুষের মতো, কোন কপাল নেই। তাদেরকে বেঁটে মানুষ বলাই ভালো। তাদের মুখগুলো ঠিক বাঁদরের মতো কালো। চোখ দুটি পিট্‌পিট করছে। মাথাটা দেহের তুলনায় অনেক বড়। সারা গা গোছা গোছা কালো চুলে ভর্তি। মাথার সামনের

দিকটা চকচকে; অর্থাৎ চুল নেই। কিন্তু পিছনে চুল আছে। তাদের দুজনের হাতে টর্চের মতো কিছু একটা আছে। তারা আমার একটা হাত ধরে কিসব হিজিবিজি করে বললো। আমি তার একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। তারপর ওরা আমাকে ঐ গোল জিনিসটার দিকে হাত বাড়িয়ে আমাকে হ্যাঁচকা টান দিল। আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে কেন এমনভাবে টানাটানি করছ। আমার মনে হলো তারাও আমার কথার একবর্ণও বুঝতে পারল না। আমাকে টানতে লাগল। আমিও রেগে গিয়ে তাদের একজনের মুখে টেনে এক ঘুঁষি ঝাড়লাম। তখন ওরা আমাকে সকলে মিলে ধরে সেই গোল মতো বস্তুর ভিতরে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের হাতের সেই টর্চের মতো জিনিসটা জেলে আমার চোখ মুখের উপর ফেলল। দেখলাম সেই জিনিসটার মধ্যে থেকে এক প্রকার সবুজ রশ্মি বেরিয়ে এল। সবুজ আলোয় আমি কেমন দিশেহারা হয়ে গেলাম। ক্রমশঃ নেতিয়ে পড়লাম। মনে হলো ঘুমে আমার চোখ বুজে আসছে। আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে তাদের কোলে ঢলে পড়লাম। তারপর আর কিছুই মনে নেই।

হঠাৎ জ্ঞান হতে দেখি যে আমি একটা গম্বুজের মতো ঘরে শুয়ে আছি। ডানদিকের একটা ফুটো দিয়ে নীল ধরনের একটা আবছা আলো ঘরটাকে ছেয়ে আছে। তারপর বাঁদিকে কি আছে দেখার জন্য ঘুরছি, অমনি ভূত দেখার মতোই চমকে উঠলাম। দেখলাম যে আমার বিছানার পাশে একটি চেয়ারে মিস্টার হার্ডসন হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে বসে আছে। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। উনিই প্রথম কথা বললেন, কি রাজুবাবু কেমন আছো? তোমাকেও আমার মতো এরা ধরে নিয়ে এসেছে। আমাকে এখানে দেখে তমি খুব অবাক হয়েছ, তাই না? আমি বললাম, অবাক? বলে অবাক! আপনি! আপনি এখানে কি করে এলেন? আমিই বা কি করে এলাম? যারা নিয়ে এল তাদের উদ্দেশ্যটাই বা কি? আপনি কি কিছু জানেন? উত্তরে—আমি এখানে এসেছি মানে এরা ধরে নিয়ে এসেছে গত পরশু দিন। তবে তেমন কিছু লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না। তবে ভয়ের কিছু কারণ নেই বলেই মনে হয়।

এমন সময় খুট্ করে বাইরে কোথাও কিছু একটা শব্দ হলো। হঠাৎ দেখি সেই গম্বুজের মতো ঘরটার কিছু অংশ সরে গিয়ে একটা দরজার মতো ফাঁক হয়ে গেল এবং সেই পথে একজন বেঁটে একটা জায়গা করে কিছু গোল গোল বস্তু নিয়ে এল। ইশারায় খেতে বলল। আমি ইতস্ততঃ করাতে হার্ডসন সাহেব বললেন, নির্ভয়ে এগুলি খেতে পার। খেলাম। সেই বেঁটেটি ইশারায় তার সঙ্গে আমাদের যেতে বলল। এবার তাকে ভালো করে দেখার সুযোগ পেলাম। কি বাজে দেখতে, সারা গা কালো চুলে ভর্তি। মুখে অবশ্য কম কিন্তু জমকালো। পায়ে ও হাতে বড় বড় নখ। একে ভৃত্য বলে মনে হলো। যা হোক ঘর থেকে বেরিয়ে চারিদিক দেখে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বাড়ির ঠিক সামনে দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীর জল স্বচ্ছ নীল। নদীর তীরে সারবাঁধা রঙবেরঙের নানা গাছ। গাছের আরো দূরে পাহাড়। চারিদিকে নীল আলো বিরাজ করছে। সেই নীলচে আলোয় পাহাড়টাকে অপূর্ব দেখতে লাগছে। বেঁটেটি আমাদের উঠোনে নিয়ে এল। এখানে একটা খুঁটি পোতা রয়েছে। সেই লোকটি খুঁটিটিকে ডানদিকে একবার ঘুরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অবাক করে দিয়ে ডান দিকের কিছু অংশ সরে গিয়ে একটা সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেল। সেই সুড়ঙ্গে আমাদের নিয়ে নেমে সেই বেঁটেটি পাশের দেওয়ালে একটা সুইচ্ টিপল। অবাকের পর অবাক। সেই সুড়ঙ্গ মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। আর সুড়ঙ্গ এর রাস্তাটা লাল আলোয় ভরে গেল। আমি জানি না আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মনে হলো মিস্টার হার্ডসন খুব মন দিয়ে সব কিছু লক্ষ্য করছে। যেন মনে হলো আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা সবই উনি জানেন।

যাহোক আমরা কিছুক্ষণ পথ চলার পর একটা বন্ধ হলঘরের সামনে উপস্থিত হলাম। এখানকার বাড়িগুলো আমাদের মতো ইঁট দিয়ে তৈরি নয় কিন্তু। এবার বেঁটে একটি সুইচ্ টিপে আমাদের সামনে যাবার জন্য ইশারা করল। আমি ইতস্ততঃ করলেও মিস্টার হার্ডসন আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। ভিতরে দেখলাম অন্য একজন বেঁটে উপুড় হয়ে কি যেন দেখছে। আমাদের দেখে সেই বেঁটেটি যা করল তা দেখে প্রথমে আমার খুব রাগ ধরল পরে হাসিতে লুটিয়ে পড়লাম। বেঁটেটি করল কি,—সোজা উঠে দাঁড়াল। তার ডান পা'টা আমাদের দিকে তুলে ধরল, তারপর বাঁ হাতে সেই পা'টা ছুঁয়ে হাতটা মাথায় ঠেকালো। অর্থাৎ নিজের পায়ের ধুলো নিজের মাথায় নিলো। আর সে হাসতে হাসতে ইশারায় তার পাশে বসতে বলল। আমি মিস্টার হার্ডসনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে বেঁটেটি আমাদের দেখে ওরকম করল কেন? উনি বললেন যে আমরা যেমন গুরুজনদের দেখলে প্রণাম করি এরাও প্রণাম করে তবে তাদের পদ্ধতিটা আলাদা। যেমন একটু আগে আমাদের করল। এখানকার নিয়ম এটাই। কোন নতুন মানুষ দেখলে এরা এমন করে।

বেঁটে মানুষটির বাঁ দিকে আমরা বসে আছি আর ডান-দিকে রয়েছে কাগজপত্র আর নানা আকারের ও নানা রঙের পেনসিল। সে পাতায় ছবি এঁকে মিস্টার হার্ডসনকে বোঝাতে লাগল। আমিও সেই ছবিগুলো দেখতে লাগলাম।

কি সুন্দর ছবি আঁকে এরা। কুৎসিত কদাকার শিল্পীরাও যে এত ভালো ছবি আঁকতে পারে তা ভেবে আমি দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ছবি দেখে মনে হলো যে সে সেই দেশের অবস্থান এঁকে হার্ডসনকে বোঝাতে চেষ্টা করছে। ছবি এঁকে বেঁটেটি যা আমাদের বোঝালো তার অর্থ হলো যে,—এটা একটা নক্ষত্র। এখানে পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহগুলোর মতো সূর্যের আলো পৌঁছায় না। এখানে দিন বা রাতে কিছুই হয় না। সব সময়ই এখানে নীলচে আলো থাকে, যেহেতু এটা একটা নক্ষত্র। আরো বোঝা গেল যে আমাদের পৃথিবী থেকে এই নক্ষত্রের দূরত্ব 120 কোটি আলোকবর্ষ মাইল। যেখানে 1 আলোকবর্ষ মাইল মানে 186000 মাইল। এবার আমার বাবা মা'র কথা মনে এল। মনটা সত্যই খুব খারাপ হয়ে গেল। পৃথিবীতে হয়ত আমার মা কিছুই এখনো খায়নি। বাবা দাদা হয়ত পুলিসে খবর পাঠিয়েছে। কিন্তু আমাকে কি তারা কোন দিনও খুঁজে পাবে। মা'য়ের সেই সদাহাস্যময় মুখটি এত দূরে বসেও অন্তরে অনুভব করছি। জানিনা মা এখন কি করছে। পৃথিবীতে হয়ত এখন রাত্রি। মা আমার জন্য না খেয়ে শুকিয়ে আছে, মা'কে দেখার জন্য আমার মন খুবই উতলা হয়ে উঠল।

হঠাৎ সেই বেঁটে লোকটি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ইশারায় আমাদেরকে তার সঙ্গে যেতে বলে আগের সেই গোল মতো বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করল। আমরাও ভেতরে ঢুকে তবেই বুঝলাম যে এটা একটা প্লেন, নানারকম যন্ত্রপাতিতে ভর্তি। ভিতরে পুতুলের মতো একটা রোবট রয়েছে। বলতে ভুলে গেছি যে পৃথিবী থেকে এখানকার দূরত্ব একটা রোবটই স্থির করে আমাদের ইংরাজীতে লিখে দেখিয়েছে। যাহোক সেই বেঁটেটি পুতুলের পিছনে একটা সুইচ টিপতেই সেটি সক্রিয় হয়ে উঠল। হঠাৎ আমরা শুনতে পেলাম সু-স্বাগতম পৃথিবীবাসী। আমরা তো অবাক। সেই রোবটের কাণ্ড এটি। রোবটটি বলল যে, আমরা সমস্ত রকম ভাষাই জানি। আমাদের এই নক্ষত্রের মানুষেরা এরকমভাবেই তৈরি করেছে। এই মানুষেরা আপনাদের চেয়ে বিজ্ঞানের দিক দিয়ে অনেক অনেক বছর এগিয়ে। বাংলা কথা শুনে হার্ডসনও যেন সক্রিয় হয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে আমাদের এখানে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে কেন? রোবোটটি উত্তর দিল যে, আপনারা আর আমরাই হচ্ছি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র জীবিত প্রাণী। আপনাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখানোর জন্য। এই সব টুকিটাকি নানা আলোচনার পর রোবট আমাদের নিয়ে উপরে উড়ল। এদের এই প্লেনটির বৈশিষ্ট্য যে এই প্লেনের মধ্যে থেকে বাইরের সমস্ত কিছু দেখা যাচ্ছে কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরের কিছু দেখা যায় না।

যাইহোক আমরা অনেক উচুঁতে উড়লাম। আমাদের পৃথিবী থেকে যেমন সূর্যকে বড় দেখায় এখান থেকে সূর্যকে দেখা গেল ক্ষুদ্র একটি তারার মতো। আমরা বুঝতে পারতাম না। রোবটটি বলে দিল। তারপর আমাদের ঐ রোবটটি একটি টেলিভিশন পর্দার দিকে দেখতে বলল। আমরা এখানে স্পষ্ট সূর্য এবং তার দশটা গ্রহ বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, এক্স এবং প্লুটো কে দেখতে পেলাম। এখান থেকে এই টি ভি মারফৎ তাদের সজ্জারীতি এবং ঘূর্ণনের চক্র খুবই অপূর্ব দেখায়। প্রতি গ্রহের সূর্যের পিঠটা উজ্জ্বল অর্থাৎ এই পিঠগুলোতে এখন দিন চলছে। আর অন্য পিঠগুলো এখন অন্ধকার মানে রাত্রি। এখন পৃথিবীর এক অংশ সাদা হচ্ছে, পৃথিবীর আমাদের প্রান্তে তখন হয়ত সকাল হচ্ছে। মা হয়ত এখনও কিছু খায় নি। মা'য়ের জন্য আমার খুব মনোকষ্ট হতে লাগল।

যাইহোক আমাদের প্লেন তখনকার মতো মাটিতে নেমে এল ঠিক আমরা যে ঘরটায় ছিলাম তার সামনে। আমি এখন খুব ক্লান্ত। তাই ঘরে ঢুকব বলে দরজা খুঁজতে লাগলাম। আমাদের বেঁটে মানুষটি এসে সুইচ টিপে দরজা ফাঁক করে দিলেন। আমি ও হার্ডসন ভিতরে ঢুকলাম। হার্ডসন দেওয়ালের একটা সুইচ টিপলেন, অমনি দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, এই নক্ষত্রটি আমাদের পৃথিবী থেকে 120 কোটি আলোকবর্ষ মাইল দূরে হয় তাহলে এখানে আমাদের পৃথিবীর মতো ঘর-বাড়ি (যদিও ইঁটের তৈরি নয়) গাছপালা, উন্নতধরনের ধাতুর তৈরি খাবার জায়গা, এত উন্নত ধরনের উড়োজাহাজ, রং বেরঙের পেনসিল সব এল কোথা থেকে? আমার মনে হলো এখানকার বিজ্ঞান আমাদের থেকে অনেক বেশি উন্নত।

আমার এই ধারণা সুনিশ্চিত হলো পরদিন বেঁটে লোকটির সঙ্গে চিড়িয়াখানার মতো একটি ঘরে গিয়ে। সেই ঘরের মধ্যে গিয়ে আমাকে অবাক করে দিল ঘরের চারদিকে কাঁচের ঘরে রক্ষিত ছোট ছোট বিচিত্র প্রাণীগুলি এবং বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট ঘরবাড়ি এবং উড়ন্ত যানগুলি। ইতিমধ্যেই আমরা এদেশের ভাষা ও আচার-ব্যবহার কিছুটা শিখে নিয়েছিলাম। পূর্বের সেই বেঁটে শিল্পীটি এসে আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু বোঝাতে লাগলো, প্রথমেই দেখালো খুব ছোট একটা প্রাণী। সেই প্রাণীটির পাঁচটি পা আছে। একেবারে শেষের দিকে ছোট পা'টি হাঁটার কাজে ব্যবহৃত হয় না। বেঁটেটি আমাদের ইশারায় বোঝালো যে তাদের এই নক্ষত্রে যে সমস্ত প্রাণী বা ঘরবাড়ি বা যান আছে এইগুলিই তাদের ছোট প্রতিমূর্তি। তা এই প্রাণীটি হলো তাদের গৃহপালিত পশু। আমাদের পৃথিবীর গরুর মতো। তারপরের তিনটি পা বিশিষ্ট প্রাণীটি দেখতে খুব ভালো। বিভিন্ন প্রাণী দেখার পর আমাদের অর্থাৎ

আমাকে এবং হার্ডসনকে দেখানো হলো পৃথিবীর বাঘের মতো একটি খুব ছোট জীব। একেবারে হুবহু বাচ্চা বাঘ। বেঁটেটি বোঝালো ঐ প্রাণীটি খুবই হিংস্র এবং এরা মাংস ছাড়া কিছুই খায় না।

আমরা প্রাণিপর্ব শেষ করে যানপর্বে প্রবেশ করলাম। সেখানে বিভিন্ন ধরনের যানগুলি দেখে আমার খুব চাপতে ইচ্ছা করছিল।

যাই হোক সেই চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে এসে বেঁটেটি দালানের উপর রক্ষিত থামে জোরে ঘা মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে একটি সুড়ঙ্গ বের হলো। সেই সুড়ঙ্গটি ছিল লাল আলোয় পরিপূর্ণ; বেঁটে লোকটি অপূর্ব ভঙ্গিমায় আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বলে সেই সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দিয়ে বিদায় নিল। সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে আমি আর হার্ডসন লাল আলোর মধ্য দিয়ে চারিদিক দেখতে দেখতে এগাতে লাগলাম। কিছুদূরে যাবার পরই আমাদের সামনে রাস্তায় যা দেখলাম তাতে আমার প্রায় দম্‌ বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হলো। এক পা'ও সামনে যেতে পারলাম না। সামনে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকার এক বাঘ। ক্রমে সেই বাঘটি এক পা এক পা করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। হার্ডসন পিছন ফিরে ছুটতে লাগলেন। কিন্তু আমি এমনভাবে বশীভূত হয়ে গেছি যে পিছতেও পারি না এগোতেও পারি না। তার সঙ্গে আমার দূরত্ব মাত্র পাঁচ গজ, সেটি লাফ-দেবার জন্য নিচু হলো, লাফ দিল, আমি শেষবারের মতো মাকে স্মরণ করে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করতে লাগলাম।

এরপর মায়ের ধাক্কায় আমার ঘুম ভাঙল, মা বলছেন—রাজু, এই রাজু কি হলো রে, ওঠ্‌ ওঠ্‌ সকালবেলায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিস! চা খাবি চল্‌।' আমি ধড়ফড় করে বিছানার উপর উঠে বসলাম।

তারপর চোখমুখ ধুয়ে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ হাতে করে প্রথমের বড় হেড-লাইন দেখেই অবাক। তাতে লেখা আছে, "কোলকাতার মিস্টার হার্ডসন ফিরে এলেন।" তারপর লেখা,—"মিঃ হার্ডসন নিজের গবেষণার জন্য কাউকে কিছু না বলে কিছুদিনের জন্য দক্ষিণ আমেরিকায় গেসলেন, কেননা তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু খুবই গোপন।"

মামুদপুর, ধনিয়াখালি, হুগলী—712302

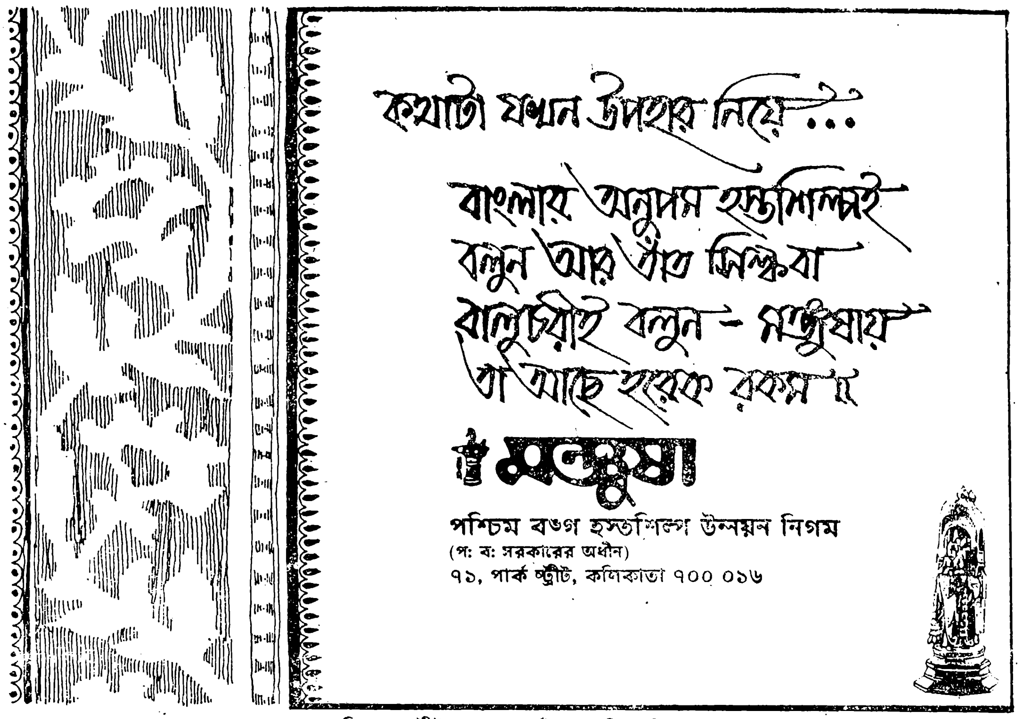

মঞ্জুষা শো রুম: লিন্ডসে স্ট্রীট, লেক মার্কেট, ঢাকুরিয়া সি-আই-টি মার্কেট, হাওড়া সাবওয়ে, দমদম এয়ারপোর্ট, বারুইপুর, সিউড়ি, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বোলপুর, হলদিয়া, দার্জিলিঙ, বনগাঁ, রায়গঞ্জ, মালদা, দিল্লী, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, জয়পুর।

DIOR 4186

শোষণ

দিনোজ কুমার দে

'শোষণ' এই শব্দটি আমাদের সকলের কাছে সুপরিচিত হলেও ভিন্নার্থে এর প্রয়োগ করে থাকি। বলপূর্বক অপহরণকে আমরা শোষণ বলে থাকি। আবার লিখতে লিখতে হঠাৎ যদি বেশ খানিকটা কালি খাতায় পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা ব্লটিং কাগজ চেপে ধরি এবং দেখি ব্লটিং কাগজ দ্রুত কালি শুষে নিয়েছে। এও এক প্রকার শোষণ যা সাধারণ অর্থে 'চোষা'। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থাৎ জীব বিজ্ঞানের ভাষায় 'শোষণ' কি তাই এখানে আলোচ্য বিষয়। তোমরা জান সব সবুজ উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে। এই খাদ্য তৈরি করার জন্য উদ্ভিদরা মাটি থেকে জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবন শোষণ করে। আপাতদৃষ্টিতে তোমাদের মনে হবে এই ব্লটিং কাগজের কালি শোষণ আর উদ্ভিদের মাটি থেকে জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবন শোষণ একই প্রক্রিয়া। কিন্তু তা নয়। ব্লটিং কাগজ দ্বারা কালি শোষণ একটি ভৌত প্রক্রিয়া। এবং এই প্রক্রিয়াতে কোন শক্তির ব্যয় হয় না। কিন্তু উদ্ভিদের জল শোষণ একটি জৈবিক প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়াতে অভিস্রবণ কাজ করে। তাছাড়া এই প্রক্রিয়াতে শক্তির ব্যয় হয়। উদ্ভিদরা মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবন প্রবেশ করায়। জীব বিজ্ঞানের ভাষায় একেই শোষণ বলে।

উচ্চ স্তরের উদ্ভিদরা মাটি থেকে জল ও জলে দ্রবীভূত লবন মূলরোমের কোষ পর্দার মাধ্যমে প্রবেশ করায়। তখন উদ্ভিদের এই মাটি থেকে জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবনের শোষণকে জল শোষণ ও আয়ন শোষণ এই দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। মাটি থেকে জল শোষণ ও সক্রিয় জল শোষণ ও পরোক্ষ জল শোষণে বিভক্ত। উদ্ভিদের এক কোষী মূলরোম মাটি থেকে জল শোষণ করে। মাটি কণার চারদিকে জল থাকে। এক কোষী মূলরোমের কোষ গহ্বরেও কোষ রস থাকে। কিন্তু মাটির জলের ঘনত্ব কোষ রসের ঘনত্ব অপেক্ষা কম। তাই অন্তঃ-অভিস্রবন প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে জল মূলরোমে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে শোষিত এই জল কোষান্তর অভিস্রবণ ও রসস্ফীতি চাপের ফলে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায়। এই রকম জল শোষণকে বলে সক্রিয় জল শোষণ। উদ্ভিদ মাটি থেকে যে অতিরিক্ত জল শোষণ করে তা পাতায় অবস্থিত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পাকারে বের করে দেয়। অতিরিক্ত জলকে বাষ্পাকারে বের করে দেওয়ার পদ্ধতিকে বলে বাষ্পমোচন। পাতার কোষে সব সময়ই ব্যাপন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। বাষ্পমোচনের ফলে পাতার কোষে ব্যাপন চাপের ঘাটতি হয়। এই ব্যাপন চাপ ঘাটতি মূলরোম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মূলরোমের এই ব্যাপন চাপ ঘাটতিই উদ্ভিদকে মাটি থেকে জল শোষণে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। এই রকম জল শোষণ পদ্ধতিকে বলা হয় পরোক্ষ জল শোষণ। বাষ্পমোচন সূর্যালোকের উপস্থিতিতে হয় বলে পরোক্ষ জল শোষণও কেবলমাত্র দিনের বেলায় হয়।

মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে উদ্ভিদের জল শোষণ বেশ কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। মাটি কণার চারদিকে সঞ্চিত জলের উপর নির্ভরশীল। সঞ্চিত জলের পরিমাণ যদি বাড়ে জল শোষণও বাড়বে। সঞ্চিত জলের পরিমাণ কমলে শোষণও কমবে। তাছাড়া বাষ্পমোচনের উপর জল শোষণ নির্ভর করে। এমন কি উদ্ভিদের বিপাক, মাটির তাপমাত্রা, মাটির দ্রবণের ঘনত্বের উপরেও জল শোষণ নির্ভর করে।

তোমরা জান সবুজ উদ্ভিদরা সালোক সংশ্লেষ পদ্ধতিতে নিজেদের খাদ্য তৈরি করে। তাছাড়া উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য বেশ কয়েকটি মৌলিক পদার্থ উদ্ভিদের প্রয়োজন। উদ্ভিদ এই মৌলিক পদার্থগুলিকে মাটি থেকে সংগ্রহ করে। তবে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থগুলি মাটিতে মৌলিক পদার্থরূপে থাকে না। থাকে নানা রকম অজৈব লবণ রূপে। উদ্ভিদ এই অজৈব লবণগুলিকে লবন রূপেও শোষণ করে না। শোষণ করে আয়ন অবস্থায়। আয়ন অবস্থায় খনিজ লবনের শোষণকে বলা হয় আয়ন শোষণ। আয়ন শোষণের সঙ্গে জল শোষণের কোন যোগাযোগ নেই। এমন কি জল শোষণের শর্তগুলি আয়ন শোষণের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। উদ্ভিদরা আয়ন শোষণ করে আয়ন বিনিময় পদ্ধতিতে। এই আয়ন শোষণে শক্তির ব্যয় হয়। এই শক্তির উৎস হল শ্বসনে উৎপন্ন অতিরিক্ত শক্তি।

উদ্ভিদের আয়ন শোষণও কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। আয়নের আয়তন যত ছোট হবে সেই আয়ন সহজে কোষে প্রবেশ করবে। যে আয়নটি উদ্ভিদ শোষণ করবে সেই আয়নটি যদি কোষে কম থাকে তাহলে শোষণ দ্রুত গতিতে হবে। তাছাড়া আয়নটি যদি স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় হয় তাহলে শোষণ দ্রুত হয়। আবার উচ্চ তড়িতাধানযুক্ত আয়ন উদ্ভিদ শোষণ করতে পারে না। আধানের পরিমাণ কম হলে শোষণ দ্রুত হয়।

শোষণ ছাড়া উদ্ভিদের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। তাই উদ্ভিদের জীবনে শোষণ অপরিহার্য। উদ্ভিদের খাদ্য ও বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত লবণ দরকার সেগুলি শোষণ প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে শোষণ করে। শস্য ক্ষেত্রে ফলন বৃদ্ধির জন্য আমরা নানা রকম জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করি। সেই জৈব ও অজৈব সারগুলি উদ্ভিদ জলের সঙ্গে শোষণ করে, ফলে আমরা প্রচুর পরিমাণে শস্য পাই।

পোঃ—পাইটা, বর্ধমান

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার পঞ্চমবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে

বিজ্ঞান সমাবেশ

'আমি ছোটবেলায় জুলে ভার্নের কাহিনী পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তাঁর কল্পনার চোখে দেখা অনেক ঘটনাই পরবর্তীকালে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান যেন ম্যাজিকের মতো, যা অসম্ভব তাই সম্ভব করে।'—বর্ষীয়ান সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র সভাপতির ভাষণে এই কথাগুলি বলেন। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার পঞ্চমবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি আরও বলেন, আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা স্কুলের পাঠ্যগণ্ডীর বাইরে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা রকম গল্প পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এ বিষয়ে তাদের আগ্রহও খুব। নিত্য নতুন তথ্য পরিবেশন করে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান তার যোগ্য ভূমিকাই পালন করে চলেছে।

পঞ্চমবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের অন্যতম বিষয় ছিল 'বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্য' শীর্ষক আলোচনা চক্র। এই আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন বিমান বসু, জয়ন্ত বসু, অমরনাথ রায় ও সমরজিৎ কর প্রমুখ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখকগণ।

গত 31শে মে, জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণে মহাবোধি সোসাইটী হলে ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক 'মহাবিশ্বে মহাকাশে' সঙ্গীতটি সমবেত কণ্ঠে গীত হয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। আমন্ত্রিত বক্তারা ছাড়া মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রধান অতিথি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্য দিলীপ সিংহ, লীলা মজুমদার ও পার্থসারথি চক্রবর্তী। শৈব্যা পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত রণজিৎ কুমার বলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ষোল বছর আগে প্রবর্তিত এই পুরস্কারটি এবারে অর্পণ করা হয় লীলা মজুমদারকে তাঁর শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্য। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার সৌজন্যে এবছর থেকে প্রবর্তিত 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পুরস্কার অর্পণ করা হয় পার্থসারথি চক্রবর্তীকে। প্রতি বছর ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ও গল্প রচনার জন্য একজন নির্বাচিত লেখককে এই পুরস্কার অর্পণ করা হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদকের স্বাগত ভাষণের পর আলোচনা চক্রের সূত্রপাত করেন সমরজিৎ কর। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানপ্রবন্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প রচনার ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু কি হতে পারে তাই ছিল আলোচনা চক্রের প্রধান লক্ষ্য।

সায়েন্স রিপোর্টার পত্রিকার সম্পাদক বিমান বসু বলেন, বিজ্ঞানের বিষয়কে সর্বজনপাঠ্য করে লিখতে হবে। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের জটিল বিষয়কে এমন ভাবে পরিবেশন করতে হবে যাতে বিজ্ঞান জানেন না এমন মানুষও বিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী হবেন। লেখকদের মধ্যে এরকম চেষ্টার অভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি পরিভাষার সমস্যার কথাও বলেন। জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে পরিভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা সৃষ্টি করে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত বসু তাঁর চিত্তাকর্ষক ভাষণে বিজ্ঞান সাহিত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। শ্রীবসুর আলোচনার বিষয় ছিল সীরিয়াস বিজ্ঞান সাহিত্য। তিনি বলেন, অনেকক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদের রচনা সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য হয় না। সেক্ষেত্রে প্রতিবেদকের ভূমিকায় অন্য কাউকে এগিয়ে আসতে হবে। যিনি বিজ্ঞানীর বিষয়গুলি বুঝে সরলীকৃত করে সাধারণ পাঠকের কাছে পরিবেশন করবেন। পরিভাষার ক্ষেত্রে অনেক আন্তর্জাতিক শব্দকে সরাসরি বাংলাতে ব্যবহার করার পক্ষে শ্রীবসু অভিমত প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় অগ্রপথিকদের কথা স্মরণ করে জয়ন্ত বসু আমাদের এই পিছিয়ে পড়া সমাজকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন অমরনাথ রায়। তিনি বলেন, আজকের দিনের খুদে পাঠকদের নানা বিষয়ে আগ্রহ। তাই বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ পাঠ্যতালিকার বাইরেও তারা নানা বিষয়ে জানতে চায়। অথচ এদের প্রয়োজন মেটাবার মতো যথেষ্ট পত্র-পত্রিকা বা বিজ্ঞানের গ্রন্থ খুঁজলে পাওয়া যায় না। ছোটদের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার পরিপূরক আরও জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া দরকার।

জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক সমরজিৎ করের আলোচনার বিষয় ছিল বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প। শ্রী কর সায়েন্স ফিকশানের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেন, বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প মানে অবাস্তব কিছু নয়, তার অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা দরকার। বিজ্ঞানের বিষয়কে উপন্যাসের মতোই রোমাঞ্চকর করে লেখা যেতে পারে। বিজ্ঞান হল সাধারণ মানুষেরই এক বিশেষ অনুভূতি। সেই অনুভূতির যুক্তিপূর্ণ প্রকাশকেই বৈজ্ঞানিক রচনা বলা যেতে পারে।

এই অনুষ্ঠানের একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার বিশেষ 'ঘনাদা' সংখ্যার প্রকাশ। সংখ্যাটির

আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন সিদ্ধার্থ ঘোষ। এইসঙ্গে তিনি কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসূচীও ঘোষণা করেন, যে পরিষদের পত্তন হয়েছে মাত্র এক বছর আগে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ—তিনি বলেন, দুভাবে কাজ করবে। স্কুলের ছেলেমেয়েরাই কেবলমাত্র এর সভ্য হতে পারবে। প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান মানসিকতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিষদ আয়োজন করবে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পপাঠ ও চর্চার আসর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য দিলীপ সিংহ প্রধান অতিথির ভাষণে পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণসহ পর্যালোচনা করেন। বিজ্ঞান সাহিত্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীসিংহ বলেন, বৈজ্ঞানিক রচনা যথার্থ রসোত্তীর্ণ হয়ে যেন তা সাহিত্যের পর্যায়ে পেঁছায় সেদিকে লেখকগণের সতর্ক দৃষ্টি থাকা দরকার। এ ব্যাপারে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আলোচনার জন্য তিনি কিশোর বিজ্ঞান পরিষদকে সায়েন্স রাইটার্স ক্যাম্প করার জন্য অনুরোধ জানান।

লীলা মজুমদার বলেন মানবিকতার আদর্শ লেখকদের রচনায় প্রতিফলিত হওয়া উচিত। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরস্কার প্রাপক পার্থসারথি চক্রবর্তী আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ছোটদের জন্য বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনায় লেখকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পঞ্চম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আর একটি অন্যতম আকর্ষণ ছিল কিশোর বিজ্ঞানীদের তৈরি মডেল ও পত্র-পত্রিকা পোস্টারের প্রদর্শনী। শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনেক পত্রিকাই পাতিরাম বুক স্টলের শ্যামল ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রদর্শিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রকাশিত 'মানুষের জয়যাত্রা' শীর্ষক রঙিন পোস্টার প্রদর্শিত হয়। কলিকাতা, 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া এমনকি সুদূর বিহারের জামসেদপুর থেকেও কিশোর বিজ্ঞানীর দল হাজির হয়েছিলেন তাদের কারিগরী কৌশল, কল্পনা আর বুদ্ধিপ্রসূত মডেলগুলি নিয়ে। এলিমিনেটর, দোলনা, লাইট মিউজিক, গোবর থেকে বিদ্যুৎ তৈরির অভিনব প্রভৃতির মডেলগুলির কলাকৌশল দেখে

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার ৫ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান সম্পাদক সমরজিৎ কর। বাঁদিক থেকে : অমরনাথ রায়, জয়ন্ত বসু বিমান বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিলীপ সিংহ, লীলা মজুমদার ও পার্থসারথি চক্রবর্তী।

ফটো : শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

দর্শকগণ চমৎকৃত হন। এই কিশোর প্রতিযোগীদের নিয়ে প্রায় সারাক্ষণই ব্যস্ত ছিলেন সিদ্ধার্থ ঘোষ, দিবাকর সেন ও জয়ন্ত দত্ত। কারণ এঁদের উপরই বিচারের ভার পড়েছিল মডেল প্রতিযোগিতার। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে কুন্তল অধিকারী, সুজন দাস ও মনোজ দাস। কুন্তলের মডেলের নাম লাইট মিউজিক। সুজন ও মনোজ তৈরি করেছিলেন গোবর থেকে বিদ্যুৎ ও ইলেকট্রনিক ডোর বেল। অন্যান্য প্রতিযোগী অভিজিৎ মিত্র, দিব্যেন্দু ভৌমিক, বিপ্লব ভট্টাচার্য, রাজীব সাধু ও কুন্তল পালকে বিশিষ্ট রৌপ্য ব্যবসায়ী মেসার্স পি. সি. দাস এণ্ড ব্রাদার্স, কলকাতা-25 প্রতিষ্ঠানের তরফে বিশেষ পদক উপহার দেওয়া হয়। মডেল নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন পত্রিকা কর্তৃপক্ষ। শব্দকুট রচনায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী সুজিত ঘোষ বিকাশ চন্দ ও সুব্রত চৌধুরীকেও মানপত্র ও পুরস্কার অর্পণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে সামান্য জলযোগ। জয়ন্ত দত্ত সমবেত অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সরকার, আকাশবাণী, দূরদর্শন ও বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের তরফে উপস্থিত প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ করতে না পারার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তাছাড়া স্কুল বন্ধ থাকায় আমরা অনেক পাঠকের সঙ্গেই যোগাযোগ করতে পারিনি। তবে ভবিষ্যতে এসব ত্রুটি অবশ্যই সংশোধন করা হবে। সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে আরও সুন্দর অনুষ্ঠান করতে পারব বলেই বিশ্বাস করি। তাঁর বক্তব্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্তি সঙ্গীতের সুর ভেসে আসে।

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার প্রেরিত শুভেচ্ছাপত্র

TATA INSTITUTE OF FUNDAMENTAL RESEARCH

National Centre of the Government of India for Nuclear Science and Mathematics

Telex : 011-3009
Code : TIFR IN

HOMI BHABHA ROAD, BOMBAY 400 005.

Telephone : 21 91 11
Telegrams : ZBTBSIS

28 May 1986

Shri Rabin Pal
Kishore Jnan Bijnan
86/1 Mahatma Gandhi Road
Calcutta 9

Dear Shri Ravin Bal,

Thank you for sending me a copy of **Kishore Jnan Bijnan** containing the translation of my science fiction story. I wish your fifth anniversary celebration seminar all success.

With kind regards,

Yours sincerely,

J.V. Narlikar

J.V. Narlikar

চেনা-অচেনা ফুল ঃ

ডাকুর

বাংলায় ডাকুর নামে পরিচিত ফুল গাছটি এগ্রি-হর্টিকালচার উদ্যান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উদ্যান, পাবলিক পার্ক ও অন্যান্য জায়গাতেও দেখতে পাওয়া যায়।

ইংরাজীতে পিংক ভিনকা ও শ্রাব ভিনকা নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক নাম কর্পসিয়া ফ্রুটিকোসা। এই উদ্ভিদটির গণের নাম নেদারল্যান্ডের ইউট্রেচটের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও উদ্ভিদবিজ্ঞান অভিধানের লেখক জ্যান কর্পসের (1765—1849) সম্মানার্থে কর্পসিয়া হয়। এই উদ্ভিদটি এপোসাইনেসি গোত্রের অর্থাৎ টগর ফুল যে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর আদিনিবাস ব্রহ্মদেশ ও মালয়। এখন প্রায় সর্বত্রই হয়।

এই উদ্ভিদটি 2—5 মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট গুল্ম বিশেষ। পাতা সরল, বড়, প্রায় উপবৃত্তাকার, তল মসৃণ, ওপরতল চকচকে সবুজ, নিচের তল একটু হলদেটে ও শিরাবিন্যাস সুস্পষ্ট।

পুষ্পবিন্যাস প্রান্তীয় সাইম। ফুল হাল্কা গোলাপী রঙের ও কেন্দ্রের দিকে সরু লাল রঙে রঞ্জিত থাকে, সমাঙ্গ ও যুক্ত পাঁচটি পাঁপড়ি বিশিষ্ট। পাঁপড়িগুলি চক্রাকারের মত, কিন্তু দলনল লম্বা হয়। সেজন্য আকৃতিতে রঙ্গনাকার ফুল বলা হয়। ফুল সাধারণতঃ মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রচুর পরিমাণে হয়। অন্যান্য মাসেও হয় তবে অত প্রাচুর্যতা থাকে না। পাঁচটি যুক্ত পাঁপড়ি নিচের অংশ যুক্ত হয়ে দলনল তৈরি করে। যদি এই দলনল ব্লেড দিয়ে চিরে ফেলা যায় দেখা যাবে পাঁচটি পুংস্তবকের পুংদণ্ডগুলি দলমণ্ডলের দলনলের গায়ে মিশে গেছে। পুংদণ্ড নেই বললেই হয়। দেখে মনে হবে নলের ভিতরের দেওয়াল থেকে পুংস্তবকগুলি উদ্ভূত হয়েছে। একে ইংরাজীতে এপিপেটালাস স্ট্যামেন বলে। এই এপিপেটালাস স্ট্যামেন এপোসাইনেসি গোত্রের বৈশিষ্ট্য।

গর্ভস্তবকে গর্ভাশয় দুটি থাকে। একে গর্ভপত্রী বলে। সাধারণতঃ একজোড়া, সরু হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এই ধরনের ফলকে ফলিকল বলে। ফল দুটি মুক্ত গর্ভপত্র থেকে জন্মে। তবে এগুলি ওপর দিকে সামান্য যুক্ত থাকে এবং ফল পেকে গেলে ফলের ত্বকের একটি প্রান্ত অপনা আপনি ফেটে বীজ ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের ফলগুলিকে ফলিকল বলে।

এই ফুল গাছটির ডাল ভাঙলে বা কাটলে দেখা যাবে সাদা দুধের মতো তরুক্ষীর নির্গত হয়। এই তরুক্ষীর বিষাক্ত। এই বিষ থেকে প্রস্তুত হয় বিষ-তীর।

এণাক্ষী বিশ্বাস

(ফটোঃ সুবল কৃষ্ণ দে)

আলো জ্বলে কেমন করে

ঝাঁপ করে আলো জ্বলে উঠল। পাওয়ার এসে গেছে। ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নেভাতে নেভাতে জিজা বলল, বাব্বা বাঁচলুম, যতই মোমবাতি বল, আলো না হলে যেন পষ্ট দেখাই যায় না। বললাম আলো প্রথম কে আবিষ্কার করেছিল জানো, জিজা চোখ তুলে চাইল। ও ঠিক একটা গল্পের গন্ধ পেয়েছে। তাড়াতাড়ি বলল, 'বল, কাকু'।

'থমাস এডিসন একটার পর একটা জিনিস আবিষ্কার করে চলতেন, আর সেই করেই তাঁর চাকরি যেত। এডিসনের সব থেকে বড় আবিষ্কার হল ইলেকট্রিক বাল্ব। তার আগে তেল বা গ্যাসে আলো জ্বলত।

ইলেকট্রিক বাল্ব আসার পর আমাদের জীবন অনেক সহজ হয়ে গেল। পথে ঘাটে, ঘরে বাইরে তাড়াতাড়ি, কম খরচায় আলো জ্বলতে রইল। ইলেকট্রিক বাল্বের ভেতরে একটা সরু তার থাকে। তাকে ফিলামেণ্ট বলে। এই ফিলামেণ্ট তৈরি হয় টঙ্গস্টেন ধাতু দিয়ে। এটি এমনই একটি ধাতু যে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু গলে যায় না। ইলেকট্রিক কারেণ্ট ঐ তারের ভেতর দিয়ে গেলে ফিলামেণ্টটা গরম হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যাতে ফিলামেণ্ট পুড়ে ছাই না হয়ে যায়, তাই বাল্বের ভেতরকার হাওয়া বার করে নিয়ে, সেখানে আর্গন বা নাইট্রোজেন ভরে দেওয়া হয়। আর দেখতেই তো পাচ্ছ, বাল্বে কেমন উজ্জ্বল আলো।

'কাকু, লোডশেডিং', আবার অন্ধকার। বললুম চুপ করে বসে থাকো, একদম নড়োনা। যাই মোমবাতি খুঁজে আনি'।

অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

আই-কিউ-টেস্ট/জুলাই '86

1. ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেমব্লি-র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন—

(a) জহরলাল নেহরু

(b) কৃষ্ণ মেনন

(c) বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

(d) ইন্দিরা গান্ধী

2. (a) জেলা, (b) মহাদেশ, (c) গ্রাম, (d) শহর, (e) দেশ—এদের যদি যথাযথ ভাবে সাজাতে হয় তবে কোন গ্রুপটি সঠিক ঃ

(i) CADEB (ii) BDEAC (iii) CDAEB (iv) CDEAB

3. প্রকৃতিতে—C^{12} আছে শতকরা—

(a) 75% (b) 98·89% (c) 84% (d) 95%

4. সাধারণতঃ সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলিতে তাপমাত্রার তারতম্য স্থলভাগের অভ্যন্তরস্থ স্থানগুলিতে তাপমাত্রার তারতম্যের মত তীব্র হয় না। এর কারণ হলো—

(a) জলের তাপ পরিবাহিতা অপেক্ষাকৃত বেশি

(b) স্থলভাগের তাপ পরিবাহিতা বেশি

(c) জলের আপেক্ষিক তাপগ্রাহিতা বেশি

(d) জলের বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক লীনতাপ বেশি

5. 10 ও 100-এর মধ্যবর্তী যে কোন সংখ্যা থেকে অঙ্ক দুটি উল্টে লিখলে যে সংখ্যা হয় তা বিয়োগ করলে বিয়োগফল সর্বদাই

(i) 5 দ্বারা বিভাজ্য (ii) 6 দ্বারা বিভাজ্য (iii) 9 দ্বারা বিভাজ্য

উপরের বিবৃতিগুলির মধ্যে

(a) তিনটিই সত্য (b) কেবল (i) সত্য (c) কেবল (ii) সত্য (d) কেবল (iii) সত্য (e) তিনটিই মিথ্যা।

মে '86 তে প্রকাশিত আই-কিউ টেস্টের সমাধান

1. 8271, কারণ অন্যগুলি যথাক্রমে 51 61 71 এবং 81 এর বর্গসংখ্যা। 2. (a) বোম্বাই (b) জয়পুর (c) পাটনা (d) আগ্রা (e) দিল্লী। 3. (c) সব লোক ভালো নয়। 4. (a) স্প্যানিশ। 5. (c) কেরোসিন তেল।

ভূগর্ভের সম্পদ ঃ

অ্যানহাইড্রাইট

এই মণিকটি একটি সরল রাসায়নিক যৌগ, যার রাসায়নিক সংকেত $CaSo_4$ অর্থাৎ কিনা ক্যালসিয়ম সালফেট। রাসায়নিক সংস্থিতির দিক দিয়ে জিপসাম এর সাথে এর মিল থাকলেও জিপসামের মধ্যে যে কেলাস জলের ভাগ থাকে, তা কিন্তু এতে শূন্য। অর্থাৎ একে জলবিহীন জিপসাম বলা চলে। এর কেলাস বড় একটা পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তা অর্থোরম্বিক গোষ্ঠীভুক্ত প্রিজমের মতো যা মোটা পাতের মতো। তবে সাধারণত সূক্ষ্ম বা মোটা দানার আকারে এবং পিণ্ডাকারেও একে পাওয়া যায়। এর কেলাসে দুর্বলতা তল, উপস্থিত থাকতে পারে, যার সমান্তরালে একে সহজেই ভাঙা যায়। এর কাঠিন্য জিপসামের চেয়ে বেশি। অ্যানহাইড্রাইট সাধারণত স্বচ্ছ হয় এবং কাচ বা মোমের মতো

দ্যুতিসম্পন্ন হয়। স্তরীভূত পাললিক শিলাতে অ্যানহাইড্রাইটের স্তর হামেশাই পাওয়া যায়। অ্যানহাইড্রাইট সাধারণত জিপসাম, চুনাপাথর এবং ডলোমাইট-এর সাথে পাওয়া যায়। এই অ্যানহাইড্রাইটই জলীয় বাষ্প শোষণের ফলে জিপসামে পরিণত হয়। অ্যানহাইড্রাইটের প্রকাণ্ড স্তর পাওয়া গেছে দক্ষিণ-পশ্চিম ডাকোটা, নিউ মেক্সিকো এবং টেক্সাসে। এছাড়াও নোভা স্কশিয়া এবং ওন্টারিওতেও অ্যানহাইড্রাইট উল্লেখযোগ্যভাবে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ভারতবর্ষে অ্যানহাইড্রাইটের ভাঁড়ার নেই বললেই চলে। তাই আমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই, অর্থাৎ অ্যানহাইড্রাইটের কাজ চালিয়ে নিই জিপসাম দিয়ে।

অমরনাথ রায়

জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট জুলাই '86

1. কোন্ প্রাণী (পাখি) রাতে বিশ্রাম নেওয়ার আগে জল পান করে?
2. নিচের কোন্ বৃক্ষের শাখা নেই?
   (ক) আম (খ) তাল (গ) জাম।
3. 'প্লাসটিড' পাওয়া যায় কোন্ কোষে?
   (ক) উদ্ভিদ কোষে (খ) প্রাণিকোষে
4. 'ইলিয়ড' এবং 'ওডিসি' মহাকাব্য দুটি কে রচনা করেছিলেন?
5. চীনাদের দুঃখের নদী কোন্‌টি?
6. প্রাচীনতম 'বেদ'-এর নাম কি?
7. প্রথম রোমান সম্রাট কে ছিলেন?
8. শিখদের সর্বশেষ গুরুর নাম কি ছিল?
9. 'পরমাণুবাদ' আবিষ্কার করেন কে?
10. পৃথিবীর শীতলতম স্থান কোনটি?
11. কোন্ খেলায় সবচেয়ে বড় মাঠের প্রয়োজন হয়?

May 1986–এ প্রকাশিত
জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সমাধান।

1. বেদ। 2. পাচক রস। 3. উদ্ভিদ। 4. ভারতের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় সুনীল গাওস্কর। 5. সম্রাট অশোকের আমলে। 6. গৌড় রাজ্য। 7. 1914 খ্রীস্টাব্দে। 8. ব্রোমিন এবং পারদ। 9. স্যার আইজাক নিউটন। 10. হাইগ্রোমিটার। 11. ময়ূরাক্ষী নদীর উপর। 12. আট ফুট।

ফোটো ক্যুইজ

ছবিটি আমাদের দেশের দুর্গের একটি অংশ। নাম কি?

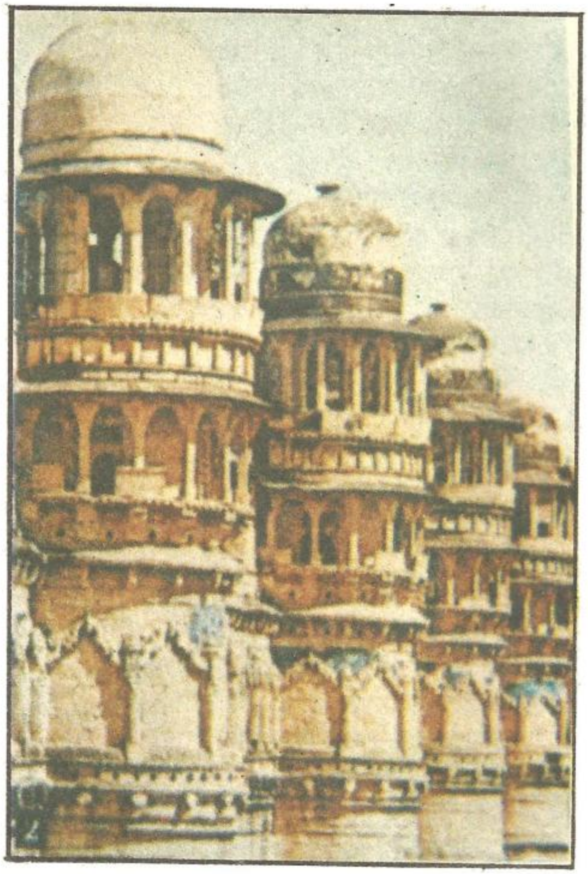

ছবিটি মহাকাশের এক মহাবিস্ময়। এর নাম কি?

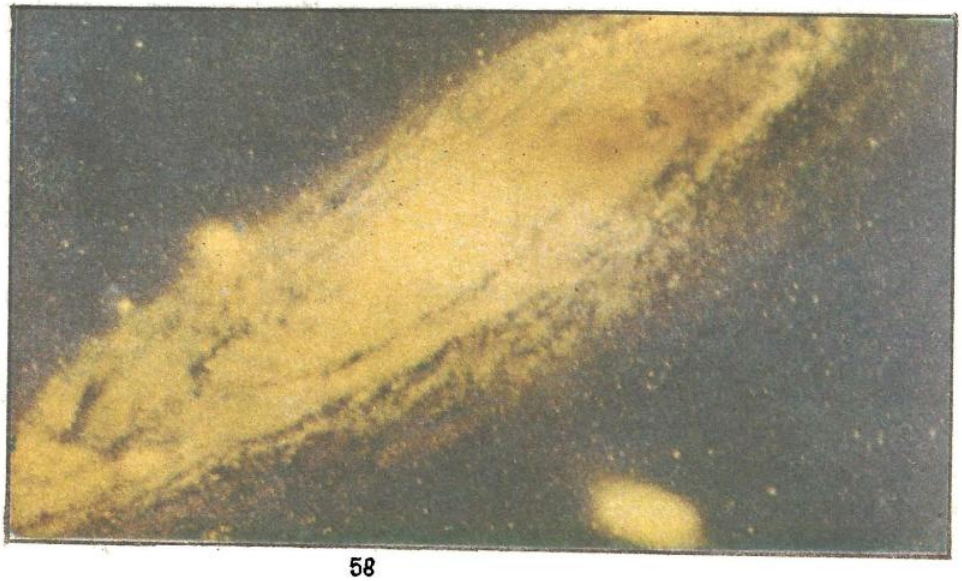

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় ● জয়ন্ত দত্ত

উত্তর সঠিক হওয়া সত্ত্বেও ঠিকানা না থাকায় আরও অনেকের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

তোমরা সকলেই জান যে '86 সংখ্যা থেকে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় প্রতিযোগিতার সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ফলে দপ্তরের কাজ বেড়েছে অনেক। প্রত্যেকের পাঠানো উত্তরপত্র মিলিয়ে নাম প্রকাশ করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার। শুধু তাই-ই নয়, পাঠানো উত্তরপত্রও নানা কারণে বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। তাই তোমাদের কয়েকটি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছি ঃ

এক ঃ প্রতিটি প্রতিযোগিতার জন্য আলাদা আলাদা উত্তরপত্র পাঠাবে। একই কাগজে একাধিক প্রতিযোগিতার উত্তর লিখবে না। কুপনে স্কুলের নাম লিখলেও উত্তর পত্রের শেষে বাড়ির ঠিকানা অবশ্যই দেবে পরবর্তীকালে যোগাযোগের জন্য।

দুই ঃ একজন প্রতিযোগী একটি মাত্র কুপনে একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে উত্তর-পত্রগুলির সঙ্গে কুপনটি আলাদাভাবে কেটে পাঠালেই চলবে।

তিন ঃ সফল প্রতিযোগীকে আগামীবারের বার্ষিক অনুষ্ঠানে মানপত্র ও পুরস্কার অর্পণ করা হবে। যারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবে না তাদের ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

মে সংখ্যা থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যে বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে তার জন্য আমরা আনন্দিত। তোমাদের উৎসাহিত করার জন্যই সফল প্রতিযোগী ছাড়াও যারা সাতটি পর্যন্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছো তাদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যা থেকে শুধু সফল প্রতিযোগীদের নামই প্রকাশ করা হবে।

পরিচালক ঃ ছোটদের দপ্তর

মডেল ও শব্দকূট প্রতিযোগিতা '86

গত বছরের মতো এবারেও মডেল ও শব্দকূট প্রতি-যোগিতায় সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট অর্পণ করা হবে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে। আগামী বছরের বার্ষিক অনুষ্ঠানে মডেল নির্মাতাদের মডেল প্রদর্শন করতে হবে বিচারকদের সামনে। মে '86 থেকে এপ্রিল '87 পর্যন্ত প্রকাশিত মডেল ও শব্দকূটগুলি এই প্রতিযোগিতায় বিবেচিত হবে।

মে 86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. দেবজ্যোতি পানি, B_2/82/2 ভি. কে. নগর, দুর্গাপুর-10, বর্ধমান।
2. অপরাজিতা দত্ত মজুমদার, প্রযত্নে, অমিতাভ দত্ত মজুমদার, কলেজ কোয়ার্টার, খড়্গপুর কলেজ, ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।
3. অনুপম বসু সরকার, প্রযত্নে, তমালকান্তি বসু সরকার কাটাপুকুর, মগরা, হুগলী—712148।

মে 86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে, কিন্তু পুরস্কৃত হলো না ঃ

হাওড়া ঃ বরুণ বিশ্বাস। **হুগলী ঃ** সুরজিৎকুমার ঘোষ। **বাঁকুড়া ঃ** সুব্রতকুমার পাত্র। **পঃ দিনাজপুর ঃ** রণজিৎ চন্দ।

মে 86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সাত বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

কলকাতা ঃ সুজিৎ সিনহা, শ্যামল যশ, তাপস চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর ব্যানার্জী, নির্মল সোম, তারকনাথ দাস।

উত্তর 24-পরগনা ঃ বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, সঞ্চিত দত্ত।

দক্ষিণ 24-পরগনা ঃ শুভব্রত মিত্র।

হাওড়া ঃ সুপর্ণা নস্কর, বিনীতা লাহিড়ী, সুদীপ্ত সাহা।

হুগলী ঃ অভিজিৎ ঘোষ, দেবমাল্য যশ, সৌম্য ভট্টাচার্য, অর্ণব মিত্র, ধ্রুব দালাল, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়।

বর্ধমান ঃ রুমা সামন্ত, পুষ্পিতা ভৌমিক, কৌশিককুমার সাহা, সুমন্ত মুখার্জী, রজত চক্রবর্তী, সুজিত দাস, অভিজিৎকুমার ঘোষ, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈকত মৈত্র, গুরুসদয় দত্ত, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, অরূপরতন দাস, চন্দ্রা রায়।

মেদিনীপুর ঃ অর্কপ্রভ গোস্বামী, সত্যজিৎ মাইতি, সুজনবন্ধু সামন্ত, ইন্দ্রাণী দে।

নদীয়া ঃ কমল সেন, অমিত সরকার, রাজদীপ সেনগুপ্ত, সুস্মিতা বিশ্বাস।

মুর্শিদাবাদ ঃ নাসিমা বেগম, আশিস মুখার্জী, উদয় প্রতাপ প্রামাণিক।

পশ্চিম দিনাজপুর ঃ শান্তনু দাস।

কোচবিহার ঃ তন্ময় চক্রবর্তী, সুতীর্থ পাল।

সিনিয়র ফটো ক্যুইজের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেনি।

মে 86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টের সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে :

1. অর্ণব রায়, প্রযত্নে, মনোরঞ্জন রায়, মসলন্দপুর, উত্তর 24-পরগনা।

2. গার্গী চক্রবর্তী, প্রযত্নে, ভবেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ও. টি. রোড, বাগনান হাওড়া—711303।

3. রজত ঘোষচৌধুরী, প্রযত্নে, রঞ্জিত ঘোষচৌধুরী, মেরী পার্ক, ওলাইচণ্ডীতলা, হুগলী।

মে 86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টে সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর যারা দিতে পেরেছে :

কলকাতা : দেবলীনা রায়, বিশ্বরূপ দাস, রাজীব মজুমদার, সুদীপ পাল, অলোক বিশ্বাস, শুভব্রত ভট্টাচার্য।

উত্তর 24-পরগনা : নির্ঝরকুমার মণ্ডল, সুন্দীপকুমার বিশ্বাস, মিতা ধর, শ্যামল দেবনাথ, দুর্গাপ্রসন্ন মণ্ডল।

দক্ষিণ 42-পরগনা : মল্লিকা বর, পলাশকুমার বড়াল, সব্যসাচী ভট্টাচার্য।

হাওড়া : অভিজিৎ চক্রবর্তী, পার্থসারথি মুখার্জী, অপর্ণা বিশ্বাস, অনির্বাণ বিশ্বাস।

হুগলী : সৌমেন মল্লিক, অরিন্দম ঘোষ, সেবাব্রত রায়, সুবীর ভট্টাচার্য।

বর্ধমান : নিলয়কুমার হাজরা, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, সুকান্ত তলাপাত্র, রূপা রায়, সিরাজ লস্কর, স্বদীপ দাস, শুক্লা চ্যাটার্জী, মৌসুমী মজুমদার, অনিন্দিতা চ্যাটার্জী, কাকলি আশ, প্রবোধ হালদার, স্বাতী সাহা, মোহনলাল চক্রবর্তী, তমাল দত্ত।

মেদিনীপুর : জয়ন্ত দত্তমজুমদার, নীলরতন মাহাতো, জয়দীপ রাউত, সুদীপ নায়ক, হিরন্ময় ঘটক, শুভঙ্কর মহাপাত্র, প্রদীপ দাস, অরূপকুমার দাশ, সৌরভ দাশগুপ্ত, অপূর্বকুমার সামন্ত, নীলেন্দু মহাপাত্র, মৃণালকান্তি কুণ্ডু, সন্দীপ নন্দ।

নদীয়া : কুন্তল কুমার সেন, সত্যজিৎ প্রামাণিক, মৈত্রেয় মণ্ডল, চন্দ্রিমা বিশ্বাস, মমতা সাহা।

মুর্শিদাবাদ : সৌগত মাইতি, মহঃ কারুজামান, মুস্তাফিজুর রহমান।

বীরভূম : শ্রাবণী মণ্ডল।

বাঁকুড়া : অংশুমান কর, চিত্তরঞ্জন দাস, শুদ্ধকল্যাণ পাল, রূপাঞ্জন সাহা।

পশ্চিম দিনাজপুর : নীলোৎপল সরকার, গৌতম কুণ্ডু।

মালদহ : সন্দীপন দেবনাথ, উজ্জ্বল কর্মকার।

কোচবিহার : অদিতি ডাকুয়া।

জলপাইগুড়ি : শুভব্রত দাস, সুব্রত রায়।

মে 86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্টের দুটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে :

1. প্রিন্স দাশগুপ্ত, 'নিবেদিতা' 140, দ্বারিক জঙ্গল রোড, ভদ্রকালী, হুগলী—312232।

2. শুচিস্মিত ঘোষ, প্রযত্নে, শ্রীকুমার ঘোষ, ব্যারাকপুর, কালিয়া নিবাস (দক্ষিণ), নোনা চন্দনপুকুর, 24-পরগনা।

3. শুভ্র সেনাপতি, প্রযত্নে, মণীন্দ্রনাথ সেনাপতি, সিঙ্গুর (বিদ্যুৎপল্লী), হুগলী।

মে 86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্টের দুটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তরদাতাদের নাম :

কলকাতা : অনির্বাণ দত্ত, অংশুমান চৌধুরী, রাজর্ষি সেনগুপ্ত, প্রবীর হালদার, দেবযানী হাজরাচৌধুরী, স্নেহাংশু সাহা, অভীক দেব, দেবলীনা রায়, দেবজ্যোতি মুখার্জী, বিশ্বরূপ দাস, দীপাংশু বসুচৌধুরী, শমীক নাগ, অনির্বাণ দাস, দীপাঞ্জন দাস, আশিস দত্ত, সুদীপ পাল, ঋত্বিক চক্রবর্তী, সুদীপ্ত ভৌমিক, সুমন বসাক, সোমনাথ বল, শান্তনু কুণ্ডু, সুকুমার ভট্টাচার্য, শশাঙ্ক রঞ্জন ভুইঞা, অনুক্তা মজুমদার, প্রভাতকুমার গোস্বামী, শীর্ষেন্দু গুহমজুমদার, লালী সরকার, দেবযানী মুখার্জী, বিনয়কুমার সাহা, প্রদীপ সরকার।

উত্তর 24-পরগনা : অনিন্দ্য দে, শম্পা মণ্ডল, অসিত ধাড়া, অর্ণব রায়, সন্দীপকুমার বিশ্বাস, সমরজিৎ ভট্টাচার্য, অঞ্জন সেনগুপ্ত, আব্দুল রসিদ মোল্যা, অলোক বিশ্বাস, মিতা ধর, দেবব্রত বল, মলয়কুমার সরকার, প্রণব সরকার, অনুপকুমার ঘোষ, শ্যামল দেবনাথ, জয়ন্ত মিত্র, দুর্গাপ্রসন্ন মণ্ডল।

দক্ষিণ 24-পরগনা : শুভেন্দুনাথ ভট্টাচার্য, সমিত সাউ, মল্লিকা বর, শর্মিষ্ঠা সেন, সঙ্গীতা চ্যাটার্জী, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, পলাশকুমার বড়াল।

হাওড়া : অভীক ঘোষ, জ্যোতির্ময় মান্না, দেবাশিস মান্না, অতনু দাস, অমিতকুমার দে, সৌরভ ভদ্র, রণজিৎ শাসমল, অভিজিৎ চক্রবর্তী, শরদিন্দু ভাদুড়ী, উৎপল কুমার মণ্ডল, শান্তনু ভট্টাচার্য, কল্যাণ সামন্ত, বিবস্বান সৎপতি, তপন ঘোষাল, সোমা ঘোষ, সুবীর নিয়োগী, সৌগত রায়, শান্তিগোপাল মণ্ডল।

হুগলী : সুমন মিত্র, ঝর্ণা কুণ্ডু, গোরাচাঁদ কুমার, শেখর চক্রবর্তী, শীর্ষেন্দু সিংহরায়, রুমা ঘোষ, স্মৃতিকণা মিত্র, সুমনকুমার দাস, প্রণবকুমার রক্ষিত, সৈয়দ ফজলুল ইসলাম, উৎপল নন্দী, শর্মিষ্ঠা চন্দ্র, সুতপা মণ্ডল, কাকলি সাহা, সোমনাথ দত্ত, জলি সাহা, অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, গৌতম মণ্ডল, শাশ্বতী সামন্ত, অরিন্দম ঘোষ, সেবাব্রত রায়, অসিত মিত্র।

মেদিনীপুর : জয়ন্ত দত্তমজুমদার, রাজদীপ দাস, সুজিতকুমার ঘোষ, সুদীপ নায়ক, অনিন্দ্যকুমার পাড়ুই, শুভ্রা বিশ্বাস, অরূপকুমার দাশ, দেবানন্দ মাজী, সুদীপ্ত ঘোষ, স্নেহলতা মাহাতো, সুসময় মিশ্র, মৃণালকান্তি কুণ্ডু, পিয়াল বায়েন, অদ্রীশ বেরা, সুমনশুভ্র সাহু, শৈবাল নন্দ, অরবিন্দ দত্ত।

নদীয়া : অসীম সরকার, শুভজিৎ মাইতি, সত্যজিৎ প্রামাণিক, ছন্দোময় মণ্ডল, সিদ্ধার্থশঙ্কর মুখার্জী, মদন বিষয়ী, সুমন বিশ্বাস, মমতা সাহা, রম্বা দত্ত।

বর্ধমান : সৌমেন্দু ভট্টাচার্য, অসীম সরকার, দীপঙ্কর সিনহা, সুকান্ত তলাপাত্র, কল্যাণকুমার গুহ, অরুণিমা দাস, সংহিতা চৌধুরী, বনানী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপ ঘোষ, জয়ন্ত বিশ্বাস, সিরাজ লস্কর, মহঃ হাবিব, স্বদীপ দাস, দিব্যেশ চট্টোপাধ্যায়, অতনু কুমার রাহা, শুক্লা চ্যাটার্জী, মৌসুমী মজুমদার, হাসি লাহা, আসগর আলি খান, রীনা গড়াই, সুমিত মুখার্জী, শ্রীরূপা ধর, শান্তনু ঘোষ, প্রবোধ হালদার, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, স্বাতী সাহা, মোহনলাল চক্রবর্তী, শুভ্রাংশু রায়, সুতপা নাথ, বনানী সরকার, তমাল দত্ত, তনুশ্রী পাল।

মুর্শিদাবাদ : ঊর্মিমালা বসু, শতদ্রু মজুমদার, চম্পক অধিকারী, প্রণবকুমার বিশ্বাস, গোলাম মোর্তাজা, হাবিবা খাতুন।

বীরভূম : শ্রাবণী মণ্ডল, পঙ্কজকুমার ঘোষ, কৃষাণ মাল, নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশান্ত মণ্ডল, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া : সুব্রত দত্ত, রামশংকর ব্যানার্জী।

পুরুলিয়া : মলয়েন্দু দিন্দা।

পশ্চিম দিনাজপুর : অসীমকুমার পান, গৌতম কুণ্ডু, জোনাকি চ্যাটার্জী।

মালদহ : অম্বর চক্রবর্তী, সন্দীপন দেবনাথ, উজ্জ্বল কর্মকার, রাজীবকুমার রায়।

কোচবিহার : কাকলি চৌধুরী, সুদেষ্ণা পাল, অদিতি ডাকুয়া।

জলপাইগুড়ি : শুভব্রত দাস, পার্থপ্রতিম দেব, সুমন মুখার্জী।

বিহার : ধানবাদ : রাজকুমার মিত্র।

আসাম : বঙ্গাইগাঁও : বলরাম দে।

মে '86-এ আই-কিউ-টেস্ট-এর (আগে আসার ভিত্তিতে) চারটি প্রশ্নের (প্রথম প্রশ্নটি বাদে) সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য যারা সার্টিফিকেটের পাবে :

1. স্বাতী আচার্য, প্রযত্নে, কানাইলাল আচার্য, প্রধান শিক্ষক ধাতকা এন. সি. এল. বিদ্যামন্দির, আসানসোল 2, বর্ধমান।
2. দেবজ্যোতি পানি, B$_2$/80/2 (ভি. কে. নগর), দুর্গাপুর-10, বর্ধমান।
3. দীপঙ্কর সামন্ত, প্রযত্নে, মদনমোহন সামন্ত, সুভাষ-পল্লী, কালীতলা, বর্ধমান—71310।।
4. অঞ্জুশ্রী শেঠ, প্রযত্নে, বিশ্বনাথ শেঠ, বাসুদেবপুর, খঞ্জনচক (হলদিয়া) মেদিনীপুর।
5. ঠাকুর দাস গাঙ্গুলী, কয়রা, ইলামবাজার, বীরভূম।
6. ইন্দ্রজিৎ সান্যাল, কোয়ার্টার নং—3/N/3, ইউনিট-4, ওল্ড সেটেলমেণ্ট, খড়্গপুর—721301।
7. রক্তিম সরকার, প্রযত্নে, রথীন সরকার, অঙ্গনা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
8. দেবাশীষ সরকার, প্রযত্নে, রেবতীরঞ্জন সরকার, প্রাচ্য ভারতী রোড, বালুরঘাট—733101।
9. নাসিমা বেগম, প্রযত্নে, আবদুল খয়ের, জিন্দিঘি হাই স্কুল, তাঁতি বিরল, মুর্শিদাবাদ।
10. তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, B$_2$/351/2 (ভি. কে. নগর,) দুর্গাপুর—10, বর্ধমান।

বিঃ দ্রঃ : মে '86-এর আই-কিউ-টেস্ট-এ প্রথম প্রশ্নটি মুদ্রণ প্রমাদ থাকায় সেটি বাদ দেওয়া হল। প্রশ্নটিতে 8271-এর পরিবর্তে 8281 পড়তে হবে। প্রথম প্রশ্নটি বাদে বাকী চারটি প্রশ্নের যারা সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে তাদের নাম সার্টিফিকেটের জন্য গ্রাহ্য হল। মে '86 থেকে আই-কিউ-টেস্ট-এ পাঁচজনের পরিবর্তে দশজনকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

আই-কিউ-টেস্ট '86 এপ্রিল সংখ্যার সমাধান

(ভ্রমবশতঃ এপ্রিল সংখ্যার আই-কিউ-টেস্টের সমাধান জুন সংখ্যায় মুদ্রিত হয় নি)

1. চা। 2. 145। 3. (b) ফসফোরিক অ্যাসিড। 4. (c) তাপীয় আয়ন। 5. (d) 12.

মডেল নির্মাতাদের প্রতি

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিতব্য যাবতীয় মডেল নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত হওয়া দরকার। পূর্বে প্রকাশিত কোন মডেলের অনুকরণ বলে প্রমানিত হলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তা বাতিল হয়ে যাবে।

মে 86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সাত বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

কলকাতা ঃ চন্দনকুমার দে, অনির্বাণ দত্ত, অজিতেশ ঘোষাল, রাজর্ষি সেনগুপ্ত, প্রবীর হালদার, দেবযানী হাজরা চৌধুরী, স্নেহাংশু সাহা, অভীক দেব, দেবজ্যোতি মুখার্জী, শমীক নাগ, ইন্দ্রশ্রী জানা, অনির্বাণ দাস, ধ্রুবদাস মহলানবীশ, জয়ন্ত ধর, দীপঞ্জন দাস, পার্থসারথি ঘোষ, আশিস দত্ত, ঋত্বিক চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাস, সব্যসাচী বিশ্বাস, সোনালী চ্যাটার্জী, রীমা দে, সুদীপ্ত ভৌমিক, সুমন বসাক, কাকলি দত্ত, সুদীপ্ত সরকার, মানস দে, সোমনাথ বল, সুব্রত সাহা, শান্তনু কুণ্ডু, সুকুমার ভট্টাচার্য শশাঙ্করঞ্জন ভুঁইঞা, শুভ্রজ্যোতি চক্রবর্তী, অনুক্তা মজুমদার প্রভাতকুমার গোস্বামী, নীলাঞ্জন বসু, সুব্রত কুণ্ডু, প্রদীপ সরকার, সুদীপ সরকার, শান্তনু রায়চৌধুরী।

উত্তর 24-পরগনা ঃ সুদীপ্ত রায়, শম্পা মণ্ডল, অসিত ধাড়া, দেবযানী সরকার, সোমা দত্ত, মৃগাঙ্ক দে সরকার, রমেশচন্দ্র মাঝি, অঞ্জন সেনগুপ্ত, কৌশিক নাথ, দেবব্রত বল, প্রণব সরকার, শৌভিক দাস, জয়ন্ত মিত্র, স্বাগত মুখার্জী।

দক্ষিণ 24-পরগনা ঃ শুভেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুমন কবিরাজ, সন্তোষ চ্যাটার্জী, তাপস মিশ্র, শর্মিষ্ঠা সেন, সৌমিত্র রায়, শুভশ্রী মণ্ডল।

হাওড়া ঃ অভীক ঘোষ, জ্যোতির্ময় মান্না, সুরজিৎ সাহা, অতনু দাস, দেবাশিস মান্না, সৌরভ ভদ্র, রণজিৎ শাসমল, সৈকত বিশ্বাস, পলাশ মুখার্জী, শরদিন্দু ভাদুড়ী, উৎপলকুমার মণ্ডল, শান্তনু ভট্টাচার্য, শৌভিক চ্যাটার্জী, কাবেরী সাহা, বিবস্বান সৎপতি, তাপসকুমার মণ্ডল, রাজশ্রী দাস, সঙ্গীতা চ্যাটার্জী, সোমা ঘোষ, হেনা হাজরা, প্রসেনজিৎ মুখার্জী, সন্দীপ লাহিড়ী, শুভাশিস দত্ত, শক্তিগোপাল মণ্ডল, সৌমিক নাথ।

হুগলী ঃ প্রিন্স দাশগুপ্ত, অশোককুমার কুমার, দীপাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু সিংহ রায়, সৌগত দত্ত, রুমা ঘোষ, স্মৃতিকণা মিত্র, সুমনকুমার দাস, অরিন্দম গাঙ্গুলী, পার্থপ্রতিম বিশ্বাস, সৈয়দ ফজলুল ইসলাম, জয়দীপ ধর, উৎপল নন্দী, হরপ্রসাদ দাস, শর্মিষ্ঠা চন্দ্র, সুতপা মণ্ডল, কাকলি সাহা, সোমনাথ দত্ত, জলি সাহা, অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, অনীত মিত্র, পার্থপ্রতিম ঘোষ, দীপ্তেন্দু গায়েন।

বর্ধমান ঃ সৌমেন্দু ভট্টাচার্য, বিধানচন্দ্র খান, বাসুদেব ঘোষ, দীপঙ্কর সিনহা, কল্যাণকুমার গুহ, অরুণিমা দাস, সংহিতা চৌধুরী, শাশ্বতী ঘোষ, স্নিগ্ধা উপাধ্যায়, বনানী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপ ঘোষ, জয়ন্ত বিশ্বাস, কুন্তল বিশ্বাস, মহঃ হাবিব, দিব্যেশ চট্টোপাধ্যায়, অতনুকুমার রাহা, মিতালী রায়, মুরারিমোহন রক্ষিত, ধীরাজ ব্যানার্জী, দেবব্রত চৌধুরী, আসগর আলি খান, রীণা গড়াই, শ্রীরূপা ধর, শান্তনু ঘোষ, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, কুন্তল রায়, অভিজিৎ নন্দী, শুভ্রাংশু রায়, প্রীতিরঞ্জন সরকার, পুলক ভৌমিক, অনুজকুমার চক্রবর্তী, সুতপা নাথ, কল্লোল ভদ্র, তনুশ্রী পাল, অমিত চক্রবর্তী, দেবজ্যোতি রায়।

মেদিনীপুর ঃ রাজদীপ দাস, শ্যামাপদ রায়, সুজিত কুমার ঘোষ, অনিন্দ্যকুমার পাড়ুই, ভাস্কর মাইতি, শুভ্রা বিশ্বাস, পার্থপ্রতিম বিশ্বাস, শাশ্বতী পাইক, দেবানন্দ মাজী, সুদীপ্ত ঘোষ, স্নেহলতা মাহাতো, সুস্মিতা মাহাতো সুসময় মিত্র, সন্দীপ কর, পিয়াল বায়েন, অঞ্জনকুমার সোম, অদ্রীশ বেরা, সুমন শুভ্র সাহু, শৈবাল নন্দ, সুমনা সেনগুপ্ত, অরবিন্দ দত্ত।

নদীয়া ঃ অনিন্দিতা বিশ্বাস, শুভজিৎ মাইতি, সীমা সরকার, ছন্দোময় মণ্ডল, সিদ্ধার্থশঙ্কর মুখার্জী, সত্যজিৎ চৌধুরী, গোলাম মোর্তাজা, সুমন বিশ্বাস, রত্না দত্ত, সুভাষ ব্যানার্জী।

মুর্শিদাবাদ ঃ ঊর্মিমালা বসু, সুব্রত সাহা, সৌম্য মুখার্জী, প্রণবকুমার বিশ্বাস, হাবিবা খাতুন।

বীরভূম ঃ রূপা রায়, সেখ মহিউদ্দিন আহমেদ, পঙ্কজ কুমার ঘোষ, ভুবনেশ্বর মণ্ডল, সুশান্ত মণ্ডল, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া ঃ সুব্রত কুণ্ডু, সুব্রত দত্ত, রাজেশ সিংহ, সুবর্ণরেখা কর।

পুরুলিয়া ঃ মলয়েন্দু দিন্দা, দীপক ঘোষ।

পশ্চিম দিনাজপুর ঃ সুব্রত ঝা, অসীমকুমার পাল।

মালদহ ঃ অম্বর চক্রবর্তী, অমিতাভ ভট্টাচার্য, সৌগত রায়, রাজীবকুমার রায়, শান্তনু সিংহ রায়।

কোচবিহার ঃ সুদেষ্ণা পাল, অসীম মৈত্র।

জলপাইগুড়ি ঃ সন্ধিৎসু রঞ্জন দাস, পার্থপ্রতিম দেব, কাকলি গোস্বামী, সুমন মুখার্জী।

আসাম ঃ ডিব্রুগড় ঃ শুচিব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিহার ঃ ধানবাদ ঃ রাজকুমার মিত্র।

ত্রিপুরা ঃ কৈলাসহর ঃ হিমাদ্রি নাথ।

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ থ্রি ডাইমেনশন্যাল বা ত্রিমাত্রিক ছবি কি? এর আবিষ্কর্তা কে এবং এই ছবিকে কিভাবে তৈরি করা হয়?—নবীন তেওয়ারী, চন্দননগর, হুগলী।

উঃ বস্তুর আকার, আয়তন, পাশাপাশি অন্যান্য বস্তু থেকে দূরত্ব—এক কথায় কোন বাস্তব দৃশ্যকে আমরা যেভাবে প্রত্যক্ষ করে থাকি এবং সে সম্বন্ধে যেমন একটা নিখুঁত ধারণা লাভ করে থাকি, ঠিক সেইভাবে বস্তু বা দৃশ্যকে যদি ছবিতে ধরে রাখা যায় তাহলে তাকে বলা হবে ত্রিমাত্রিক ছবি। মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ ফটোগ্রাফিতে বস্তুর দ্বিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

ইনটারফিয়ারেন্স অব্ লাইট বা আলোকের ব্যতিচার এবং ডিফ্রাকশন অব্ লাইট বা আলোকের বিচ্ছুরণ—এই দুই নিয়মকে কাজে লাগিয়ে ত্রিমাত্রিক ছবি গঠন করা সম্ভব হবে বলে প্রথম ঘোষণা করেছিলেন অধ্যাপক ড্যানিশ গাবর। তাঁর ধারণা হয়েছিল, সম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের দুটি আলোকরশ্মি দুটি উৎস থেকে উৎপাদন করে যদি বস্তুর উপর কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে সমদশায় আপতিত করা যায় তাহলেই পর্দায় গঠিত হবে বস্তুর ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব। কিন্তু সেদিন সাদা আলো থেকে কোন বিশেষ বর্ণের আলোককে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় গাবরের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

পরে আবিষ্কৃত হলো লেসার পদ্ধতি এবং ঐ পদ্ধতিতে সম্ভব হলো সাদা আলো থেকে বিভিন্ন বর্ণের আলোককে বিচ্ছিন্ন করা। আর তখনই কিছু কিছু বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন গাবরের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে বাস্তব রূপ দিতে। শেষে মিশিগানের একদল বিজ্ঞানী এমন অসম্ভবকেও সম্ভব করে অক্ষয়কীর্তির অধিকারী হলেন। পদ্ধতিটির নাম হলো হলোগ্রাফি এবং যে ফিল্মের উপর কোন কিছুর ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তার নাম হলোগ্রাফ।

গাবরের পূর্বে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠন করার পদ্ধতি চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। পদ্ধতিটির নাম টমোগ্রাফি। তবে এতে এক্স রে-র সাহায্যে মানবদেহের অভ্যন্তরের যন্ত্রপাতিগুলির ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করা হতো। এই পদ্ধতিটির আবার তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন অস্ট্রিয়ার এক গণিতজ্ঞ জে. রাদোন। গডফ্রে নিউবোল্ড হাউনস্ফিল্ড নামে ইংলণ্ডের এক প্রযুক্তিবিদ ই. এম. আই নামক একটি যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে রাদোনের পরিকল্পনা সার্থক হয়। যন্ত্রটির প্রধান উৎস এক্সরে ও ফটোগ্রাফিক প্লেট। রোগীকে কোন এক জায়গায় স্থিরভাবে বসিয়ে রেখে এক্স-রে উৎসটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রোগীর বিভিন্ন অবস্থানের বহুসংখ্যক ছবি তৈরি করতে হয়। তারপর সেই ছবিগুলিকে যন্ত্রগণকের সামনে ধরলে যন্ত্রগণকই দেহের অভ্যন্তরের যন্ত্রপাতি, টিউমার ইত্যাদির ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করে দেয়। এমন এক মহান অবদানের জন্য প্রযুক্তিবিদ হওয়া সত্ত্বেও হাউনস্ফিল্ডকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল। যন্ত্রটির বর্তমানে আরও অনেক উন্নতি হয়েছে।

গাবর হয়ত উক্ত ঘটনা থেকে উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন বস্তুর আসল স্বরূপকে মুদ্রিত করে রাখতে। তবে তিনি নিজে বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন।

হলোগ্রাফ জিনিসটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতই। গ্রামোফোন রেকর্ডে যেমন শব্দের ছাপ ফেলা হয় এখানে তেমনই লেসারের সাহায্যে ফিল্মের উপর দৃশ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব মুদ্রিত করা হয়। গ্রামোফোন রেকর্ডকে হাতে করলে যেমন গান শোনা যায় না বা গানের লিপি পাঠ করা যায় না, এতেও তেমনই কোন ছবিকে দেখা যায় না।

দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করতে গেলে পুনরায় সেই লেসারের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ ফিল্মের উপর ফেলতে হয় লেসার রশ্মি। আবার তৈরির সময় যে ধরনের রশ্মি ব্যবহার করা হয়েছিল, পুনরুদ্ধারের সময়ও সেই একই রশ্মিকে ব্যবহার করতে হয়। তবে মুদ্রিত করার সময় যে দিক থেকে রশ্মিকে ব্যবহার করা হয়েছিল পুনরুদ্ধারের সময় ব্যবহার করা হয় তার বিপরীত দিক থেকে। এক্ষেত্রে মুদ্রণের সময় আলোকের ব্যতিচারের নিয়ম এবং উপস্থাপনের সময় বিচ্ছুরণের নিয়ম কাজ করে। বর্তমানে আবার আলোক তরঙ্গের পরিবর্তে শব্দতরঙ্গকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ত্রিমাত্রিক ছবি সহজে নষ্ট হয় না। আর এই ছবি তুলতে দরকার হয় না ক্যামেরা, লেন্স প্রভৃতির। আরও মজার কথা, ঐ পদ্ধতিতে অনেক দেশ বর্তমানে সিনেমার ছবিও তৈরি করছে। এতে ফুটে উঠে একেবারে বাস্তব দৃশ্য ও বাস্তব পরিবেশ। সিনেমার সাদা কালো কিংবা রঙিন ছবি নয়। আমরা বস্তুকে যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত এও হুবহু তাই। আশ্চর্যজনক এই আবিষ্কারের জন্য এর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত যিনি গ্রহণ করেছিলেন, সেই ড্যানিশ গাবরকে 1971 সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে উক্ত পদ্ধতি এমনকি টমোগ্রাফিরও প্রচলন হয়নি।

কালিন্দী, মেদিনীপুর।

সুধাংশু পাত্র

এমারজেন্সি ল্যাম্প

দীপঙ্কর মান্না

এমার্জেন্সী এই লাইট তৈরি করতে গেলে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি দরকার—

Resistance—	2·2K, 10w	—2 pc
	680K „	—1 pc
Transistor—	AD14I	1 pc
	BC158	—1 pc
Condencer—	10MFD/12V	—1 pc
Diode—	IN4001	—1 pc
2·4V Torch Lamp		—1 pc
ON/OFF switch		—1 pc
3V Batt		

এবার শিখে নাও এই লাইট তৈরির কৌশল। প্রথমে নজর দাও সার্কিট ডায়াগ্রামে। সারকিট অনুযায়ী প্রতিটি পার্টস ভাল করে সোল্ডার কর। সার্কিট তৈরি হয়ে গেলে আর একবার ভাল করে মূল সার্কিটের সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

এবার 680K-এর একটি লিড্ IN4001 Diode-এর Negative প্রান্তে যোগ কর। 680K-এর বাকি লিড্টির সঙ্গে একটি তার যুক্ত কর। এবং সার্কিটের groundয়ে আরো একটি তার যুক্ত কর এই দুইটি তার A.C. 220V লাইনে যুক্ত কর। লাইনে যুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাম্পটি নিভে যাবে। কিন্তু জ্বলে উঠলেই বুঝবে লোডশেডিং হয়েছে। সাবধান, সার্কিট যখন মেন লাইনে যুক্ত থাকবে তখন খালি পায়ে সার্কিটটি ধরবে না। সার্কিটটি বানানোর পর ছোট কাঠের বাক্সে রেখে দিলে ভাল হয়।

সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে ল্যাম্পটিকে ইচ্ছামত জ্বলানো কিংবা নেভানোর জন্য।

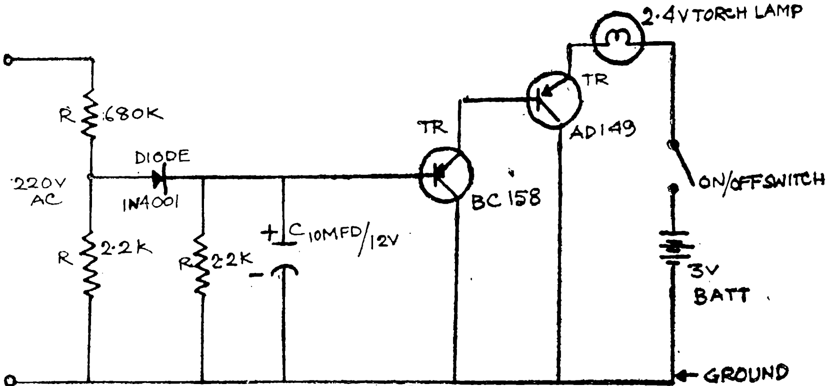

CIRCUIT DIAGRAM

বনমালী চট্টা, মেদিনীপুর

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

তিরিশটি মডেলের সরল সচিত্র নির্মাণ পদ্ধতি।

প্রকাশিত হয়েছে। দাম দশ টাকা। ভি. পি. ১২·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ। ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

আমাদের প্রকাশিত
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

অজয় কুমার চক্রবর্তী
বিদ্যুতের রূপকথা ১০·০০

রাধাগোবিন্দ চন্দ্র
ধূমকেতু ২০·০০

দেবব্রত ভট্টাচার্য ও
অজয়কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত
নানাচোখে ঋষিবিজ্ঞানী
জগদীশচন্দ্র ২৫·০০

মণীন্দ্র ঘটক
আচার্য জগদীশচন্দ্র ১০·০০

Editors : Dibakar Sen
& Ajoy Chakraborty
J. C. Bose Speaks 75·00

প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী
আ মরি বাংলা ভাষা ১০·০০

নিখিল রঞ্জন রায়
দেব দেউলের দেশে ১৫·০০

ডঃ দিলীপ ঘোষ
বাংলার লোকনাট্য ঃ
আলকাপ ১৫·০০

[আমরা বাংলাদেশের মুক্তধারা প্রকাশিত শিশু ও কিশোরদের বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বই এবং বড়দের প্রায় 1000 বইয়ের প্রধান পরিবেশক।]

পুথিপত্র
9 এ্যান্টনি বাগান লেন, কলি-9
2 বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-73

বিজ্ঞান সংবাদ

সায়েন্স এপটিটিউড এণ্ড ট্যালেন্ট সার্চ টেস্ট

অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স টিচার্স এসোসিয়েশন পঃ বঃ শাখার উদ্যোগে Science Talent and Aptitude Search Test '86 আগামী 24 সেপ্টেম্বর 1986তে অনুষ্ঠিত হবে। নাম রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ 9 আগস্ট 1986।

নতুন পরীক্ষাকেন্দ্র খোলা ও অন্যান্য ব্যাপারে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

অণিমা বোস — জেনারেল সেক্রেটারী
এস. এন. গিরি — জয়েণ্ট সেক্রেটারী

অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স টীচার্স এসোসিয়েশন
74 বেলতলা রোড, কল-26

দেবেন্দ্রমোহন শতবার্ষিকী

গত 10মে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে সত্যেন্দ্র ভবনে বিজ্ঞানী দেবেন্দ্র মোহন বসুর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন জয়ন্ত বসু ও বীরেন্দ্র বিজয় বিশ্বাস। তিনি প্রয়াত বিজ্ঞানীর অবদানের কথা স্মরণ করে বলেন, দেবেন্দ্রমোহন বসুর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির পুনঃ প্রচারিত হওয়ার প্রয়োজন। সভাপতি জয়ন্ত বসু বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিমলেন্দু মিত্র, সুকুমার গুপ্ত প্রমুখ বক্তাগণ বিজ্ঞানীর কর্মজীবন আলোচনা করেন।

হেয়ার স্কুল সায়েন্স ক্লাব

গত 17মে হেয়ার স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের উদ্যোগে বিদ্যালয়ে সায়েন্স ক্লাবের উদ্বোধন হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রধান শিক্ষক, নিমাই চক্রবর্তী। সুকুমার গুপ্ত, সুখময় ভট্টাচার্য প্রমুখ বিজ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ইণ্টারন্যাশন্যাল চিলড্রেন্স সায়েন্স ক্লাব আয়োজিত বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পপ্রতিযোগিতা

ইণ্টারন্যাশন্যাল চিলড্রেন্স সায়েন্স ক্লাব-এর পক্ষ থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, গল্পটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী ও সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী এই দুটি বিভাগে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রবেশ মূল্য 1 টাকা। রচনার সঙ্গে প্রধান শিক্ষক / শিক্ষিকার সই আবশ্যক। ডাকযোগে সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার পাঠানো হবে। লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ তারিখ 15ই জুলাই। এব্যাপারে আরও খবরের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে ঃ

ইণ্টারন্যাশন্যাল চিলড্রেন্স সায়েন্স ক্লাব
67, প্রশান্ত রায় রোড, ইস্ট বড়িশা, কলকাতা-8

শব্দকূট / সুকৃৎ ঘোষ

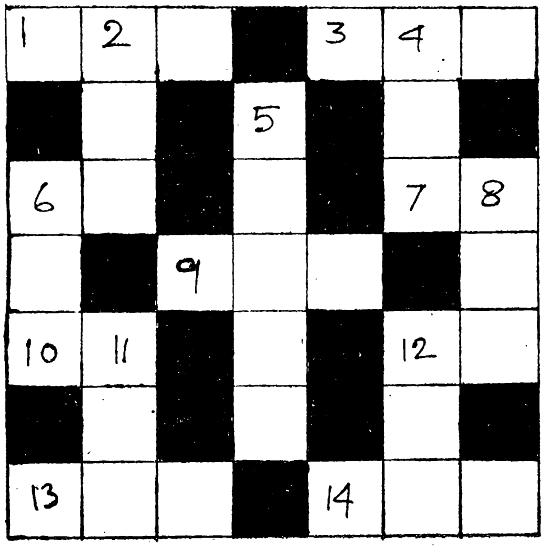

পাশাপাশি ঃ—1. উদ্ভিদের যে বর্জ্যপদার্থ চামড়া পাকা করতে ব্যবহৃত হয়, 3. কফিগাছের বর্জ্যপদার্থ, 6. বংশগতির ধারক ও বাহক, 7. ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কারক, 9. উদ্ভিদের একটি ট্রেস এলিমেণ্ট, 10. 1921 সালে নোবেলজয়ী ব্রিটিশ পদার্থবিদ, 12. ওজন বিশেষ, 13. এক শ্রেণীর খাদ্যোপাদান, 14. পাইন গাছের বর্জ্য পদার্থ।

উপর-নিচ ঃ—2. একপ্রকার নিষ্ক্রিয় গ্যাস, 4. যে জার্মান রসায়নবিদ রক্তের হিমোগ্লোবিন আবিষ্কার করেন, 5. নিউজীল্যাণ্ডজাত যে পদার্থ বিজ্ঞানী 1908 সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, 6. প্রখ্যাত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ, 8. 'Displacement'-এর বাংলা পরিভাষা, 11. কীটপতঙ্গ নাশক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ, 12. এক শ্রেণীর শর্করা। সিউড়ি, বীরভূম।

সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট, আইকিউ টেস্ট, এবং ফটো ক্যুইজ-এর উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি...

বয়স.................... শ্রেণী....................

বিদ্যালয়ের নাম.......................................

আই কিউ টেস্ট/সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ফোটো ক্যুইজ- এর উত্তর পাঠালাম।

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

জুলাই সংখ্যার জুনিয়র ও সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর গঙ্গা যমুনা

জুলাই সংখ্যার জুনিয়র ও সিনিয়র ফোটো ক্যুইজের উপহার

অজয় হোমের বিচিত্র জীবজন্তু

জুনসংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

শতঘরী ঘনাদা কূটের সমাধান

1 ব	2 ন	ম্যা	লী	ন	3 স	4 ক	5 র	লে	ন
6 নো	য়া	র	নৌ	কো	ত্রি	ভু	থ	7 মা	হি
য়া	8 ঘ	না	দা	9 ট্টে	লু	র	স	হ	10 ঙ্গি
11 রি	ন	সে	ন	ক	ক্সি	12 খঁ	13 টা	14 ই	গা
15 তা	16 না	17 কা	18 হে	টা	টাঁ	19 চো	ই	য়া	র
20 কে	চ	দা	জো	ই	ল্যা	মো	ন	কু	কা
21 কা	রা	কু	ল	22 টে	ল	হি	23 ক্যা	ট	উ
24 পো	25 কা	26 শি	বু	27 জ্যা	নি	য়া	28 রু	ন	স্টা
29 টুঁ	চ	30 শি	শি	31 টু	ব	ন	32 জু	বে	র
33 সু	[illegible]	34 বু	কি	চি	লে	রি	জো	35 জু	ডু